ধর্ম্ম প্রচার
গ্রন্থাবলী ২য় সং

আশ্রম চতুষ্টয়।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল প্রণীত।

—:o:—

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস্ হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২৫ নং রায়বাগান্ ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১[illegible]।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

যিনি জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যথাসময়ে গার্হস্থ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর্য্যধর্ম্মানুরাগী আদর্শগৃহী পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺কৈলাসচন্দ্র সান্যাল মহাশয় ও পূজনীয়া মাতৃদেবীর পবিত্র জীবনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এই গ্রন্থ খানি তাঁহাদের পাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম। ইতি

প্রণত

ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

সূচীপত্র।

২২১১

ভূমিকা।

ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষি জীবনকে কখনও ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিয়াছিলেন যত দিন ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ততদিনই আমরা প্রকৃত পক্ষে জীবিত—এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলেই মৃত্যু। যতদিন সাগরের জলোচ্ছ্বাস নদীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আলোড়িত করিয়া যায় ততদিনই তাহার জীবন। যেদিন নদীর মুখে মৃত্তিকা রাশি জমিয়া তাহাকে সাগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় সেই দিনই তাহার মৃত্যু। প্রসন্ন আনন্দধারা সেদিন আর তাহাকে স্পন্দিত করিয়া তুলেনা, সেদিন পঙ্কের মধ্যে শৈবালের মধ্যে পূতিগন্ধের মধ্যে তাহার অবসান হয়।

আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি সে কিছুই নয় যদি ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন থাকে। সেই সংযোগসূত্র ধরিয়া আমরা যেখানেই যাই আমরা ব্রহ্মেরই নিকটে থাকি; বিনাশ আমাদের নিকট অগ্রসর হইতে পারে না। আর্য্য ঋষি এই তত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয় কুণ্ডে চিরপ্রজ্বলিত হোমাগ্নির ন্যায় নিরন্তর প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাহারই ফল। সংসারের মধ্য দিয়াই যখন আমাদের পথ—যে পথে মায়া, মোহ, অজ্ঞান, ইন্দ্রিয়াসক্তি, পদে পদে আমাদের ব্রহ্ম হইতে বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য "থানা পাতিয়া" বসিয়া আছে,—তখন ত আমাদের

পদে পদে বিপথে যাইবারই সমূহ সম্ভাবনা। তাই আর্য্য ঋষি নিয়মের দ্বারা বিধির দ্বারা শৃঙ্খলার দ্বারা আমাদের সাংসারিক জীবনকেও এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, যাহাতে আমাদের জীবন ব্রহ্ম হইতে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন না হয় এবং অবশেষে সমস্ত মায়া—সমস্ত অজ্ঞান—সমস্ত বিক্ষেপকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মেই অবসান লাভ করিতে পারে।

যখন জীবনের উষাকালে তখনো চারিদিক শান্ত—স্নিগ্ধ, যখন দুঃখ তাপের প্রখর রৌদ্রজ্বালা চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দেয় নাই—যখন উন্মাদ বাসনার ধূলিঝঞ্ঝা হৃদয়ের স্নিগ্ধ—নীলাকাশকে ধূসর করিয়া তুলে নাই—ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগকে দৃঢ়ীভূত করিয়া লইবার সে এক স্বর্ণ সুযোগ। আর্য্যঋষি সেই শুভ অবসরে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উদার প্রকৃতির আনন্দময় বক্ষের মধ্যে, স্নিগ্ধ তপোবনের ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর পবিত্র চরণতলে, আপনার অকলঙ্ক হৃদয়ের সুপবিত্র বেদি-মূলে ব্রহ্মের বিশ্বব্যাপী স্পন্দন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া লইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবসর। তাই ব্রহ্মচর্য্য পালনের স্থান সংসারে নহে—ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষির সুপবিত্র তপোবনে। ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ সুদৃঢ় হইলে—ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের পথ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হইলে গার্হস্থ্যের প্রতিষ্ঠা।

যেখানে চারিদিকে বিলাস ও বাসনার তীব্র আকর্ষণ—দুঃখ তাপ হর্ষ পুলকের নিত্য চঞ্চল ছায়াবাজি, ইন্দ্রিয়ক্ষোভের বিবেকাচ্ছাদী ধূসর ধূলি-ঝঞ্ঝা—মোহের আকাশ-ব্যাপী নিবিড়

ঘনঘটা—সন্দেহের বিদ্যুদ্দীপ্তি, অহঙ্কারের তাণ্ডবনৃত্য—ব্রহ্ম সংযোগের প্রচুর সম্বল সঙ্গে করিয়া আসিলেও সেখানে পদস্খলনের পূর্ণ সম্ভাবনা। তাই এখানেও সাধন, এখানেও সংযম, এখানেও তপস্যা—ব্রহ্মের সঙ্গে সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা। ইহাই—গার্হস্থ্য।

এতেতেও যদি কিছু কালিমা লাগিয়া থাকে—যদি বাসনার কোন কুশাঙ্কুর—"ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর তবু তীক্ষ্ণতম"—হৃদয়ের ক্ষেত্রে কোথাও রহিয়া গিয়া থাকে—তাই বানপ্রস্থ—সংযমের পরে ত্যাগের সাধনা। একে একে সব ছাড়িতে হইবে—অঙ্কুর উন্মূলিত করিতে হইবে—কঠোরতর সাধনায় তীব্রতর তপস্যায় ব্রহ্মে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হইবে—সংযোগকে পরিপূর্ণ মিলনে পরিণত করিতে হইবে।

সন্ন্যাসে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। বিষয়ের সংসর্গ ছাড়িয়া মোহের আবরণ ঘুচাইয়া—অহঙ্কারকে ভস্মীভূত করিয়া ভগবানে পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জন।

ইহাই ঋষি প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ধর্ম্ম।

ব্রহ্ম যদি সত্য হন এবং ব্রহ্মের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিলনই যদি জীবনের ব্রত হয়—তাহা হইলে জীবনযাপনের এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুন্দরতর ব্যবস্থা অসম্ভব।

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সাধন করিতে হইলে জীবনকে প্রকৃত প্রস্তাবে সার্থক করিতে হইলে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"। মনুকথিত সদাচার, নিয়ম, জীবনযাত্রাপ্রণালী দেশ হইতে উঠিয়া যাওয়ায় আর আমরা তেমন করিয়া ঋষিদের মত সবল অনুকরণে

সচেতনভাবে ধর্ম্মকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিতে পারি না—তাই এই ঘোর অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে আমি স্বদেশবাসী সজ্জন-বর্গের জন্য মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ইহার অধিকাংশ কথা সঙ্কলন করিয়াছি। ইহা ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের অপূর্ব্ব প্রতিভার অমৃতময় ফল এবং তাহাই আজ সাদরে ভ্রাতৃবৃন্দের করকমলে উপহার দিতেছি।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস—ইহাই হিন্দুর—ইহাই মানবের একমাত্র নিষেবিতব্য পন্থা। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া মানুষের কল্যাণ—উন্নতি—শান্তি অসম্ভব।

ব্রহ্মকে যতদিন আমরা সমস্ত কার্য্যের মধ্যে, সমস্ত অবস্থার মধ্যে, সমস্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব, ততদিন কিছুতেই আমরা সার্থক হইতে পারিব না।

সেই সকল শক্তির আধার—সকল পবিত্রতার অমর উৎস—সকল আনন্দের নিত্যনিকেতন হইতে যতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিব ততদিন কেহই আমাদের কল্যাণ ও আনন্দ দিতে পারিবেনা—ততদিন দুর্ব্বলতা আমাদের পঙ্গু করিয়া রাখিবে, "জগদ্দল" প্রস্তরের মত পাপ আমাদের বুকের উপর চাপিয়া থাকিবে—দুঃখ আমাদের বেদনা দিবে—নিরানন্দ আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণ চির ম্লান করিয়া রাখিবে!

বিদ্যাবুদ্ধি, সাহস, অধ্যবসায় কেহই আমাদের প্রকৃত উন্নতি দিতে পারিবে না।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় পবিত্র

জীবন যাপনের স্পৃহা যদি এক জনের হৃদয়েও বলবতী হইয়া উঠে এই গ্রন্থখানি পাঠে ঋষিদিগের জগৎপূজ্য পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণে একজনের চিত্তও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে এবং একজনও প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং পবিত্র ঋষিকুলের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন—তাহা হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

সাহেবগঞ্জ
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

গ্রন্থকার

মুখবন্ধ।

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভি র্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্ম স্তন্নিবোধত" ॥ মনু

"যে ধর্ম্ম রাগ দ্বেষ লোভ মোহাদি চিত্তধর্ম্ম হইতে প্রসূত হয় নাই; মূর্খ দুঃশীল পুরুষ প্রবর্ত্তিত অজ্ঞানমূলক ইতরধর্ম্মের ন্যায় যাহা কালে উৎপন্ন হইয়া কালেই লয় পায় না, পরন্তু স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বেদ প্রবর্ত্তিত বলিয়া যাহা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; শাস্ত্র-সংস্কৃতমতি প্রমাণ প্রমেয় স্বরূপ কুশল বেদবিদ্ বিদ্বান অথচ অনুষ্ঠানপর সাধুগণ চিরদিন যাহার অনুষ্ঠান ও আদর করিয়া আসিতেছেন; যাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে হৃদয়ই বিশেষ প্রমাণ ইতর ধর্ম্মের ন্যায় যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের আক্রোশন নাই, পরন্তু চিত্তপ্রসাদ আপনাপনি উপস্থিত হয়; সেই বেদপ্রমাণিত শ্রেয়ঃসাধন ধর্ম্মতত্ত্ব আপনারা অবধান করুন"।

পূজ্যপাদ ঋষিগণ ধর্ম্মের যে সাক্ষাৎ চারিটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যিনি অবিহিত হইয়া সেই চারিটি লক্ষণ সমন্বিত ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন—তাঁহারি যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যক্ষ লাভ হয়। ধর্ম্মের এই চারিটী লক্ষণ যথাক্রমে বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মপ্রসাদ। বেদের সম্যক্ জ্ঞানেই দ্বিজাতির চরম অপরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান হয়—কিন্তু শুধু অধ্যয়ন করিলেই বেদজ্ঞান লাভ হইবার

নহে—তাহা দুশ্চর তপস্যা দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্মসনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ" ॥

এই বেদ পাঠের অধিকারী সকলেই নহে। মন্বাদি ঋষি প্রণীত স্মৃত্যুক্ত সদাচার দ্বারা যাঁহারা পাপশূন্য হইয়াছেন তাঁহারাই বেদাধ্যয়নের যথার্থ অধিকারী। অন্যথা

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্" ॥

যিনি শাস্ত্রবিধির উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিতে যান—তিনি ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধিলাভ করেন না এবং তিনি সুখ বা পরমাগতি লাভে বঞ্চিত হন। সুতরাং সদাচার-বর্জ্জিত ব্যক্তি বেদাদি অধ্যয়ন করিয়াও বেদজ্ঞান লাভে বঞ্চিত হন। মনুতেই আছে ঃ—

"আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ" ॥
"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদ ফল মশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ" ॥
"এব মাচরতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম।
সর্ব্বস্য তপসো মূল মাচারং জগৃহুঃ পরম্" ॥

"আচার প্রতিপালন যে পরমধর্ম্ম ইহা বেদ এবং স্মৃতি উভয়ত্রই প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব আত্মজ্ঞানী দ্বিজ সদাই আচারানুষ্ঠানে

যত্নবান থাকিবেন। আচারভ্রষ্ট হইলে ব্রাহ্মণ বেদের ফলভোগী হইতে পারেন না; পরন্তু আচার যুক্ত থাকিয়া যদি তিনি বৈদিক অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ফলভাগী হইতে পারেন। মুনিজনেরা এইরূপ আচার হইতে ধর্ম্মপ্রাপ্তি দেখিয়া আচারকে সকল তপস্যার মূল কারণ জানিয়া ইহাকে পরম শ্রেয়ঃ বোধে গ্রহণ করিয়াছেন।”

তপস্তেজো বিহীন দ্বিজাতিরা অধুনা বেদাধ্যয়ন করিয়াও সেইজন্য কিছুমাত্র শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিতেছেন না—বেদাধ্যয়নের যে চরম ফল “আত্মপ্রসাদ” তাহা তাঁহাদের নিকট অনাস্বাদিতই থাকিয়া যাইতেছে। এবং এইজন্যই বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মাদি করিয়াও কেহ কোন সুফল লাভ করিতেছেন না। যেরূপ সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া বেদাদি অধ্যয়ন করিতে হয় কালবশে সে সংস্কার হইতে আমরা এতটা স্খলিত হইয়া পড়িয়াছি এবং অনভ্যাস এতটা বদ্ধমূল হইয়া গেছে যে আজ তাহার কথা স্মরণ করিতেও ভয় হয়, মনে জড়তা আসে এবং বুদ্ধি তাহাকে তেমন করিয়া গ্রহণ করিতেও চাহেনা। তাই আমাদের এত দুর্দ্দশা—এত হীনাবস্থা!! যে বেদবিধিকে সম্মান করিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মকে সম্পন্ন করিয়া একদিন আমাদের পিতামহরা সমস্ত বিষয়বাসনাকে তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন—অর্থকে অনর্থ এবং দেহেন্দ্রিয়াদির ক্ষুধাকে অগ্রাহ্য করিতে সমর্থ হইয়া—পরমাত্মার ধ্যান সমাধিতে—আত্মপ্রসাদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন—সে দিন কোথায়? আজ এই বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতালোকে সে স্মৃতি আমাদের নিকট বহুদিন গত স্বপ্নের স্মৃতির

মত এমনি অস্পষ্ট যে আজ আর তেমন করিয়া তাহার আকর্ষণ শক্তিকে অনুভব করি সে সামর্থ্যও আমাদের নাই।

যে কারণেই হউক ধর্ম্মের সেই সত্য জাগ্রত জীবন্ত মূর্ত্তিটি আর আমরা দেখিতে পাই না—তাই আজ ঘরে ঘরে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—তাই আজ প্রতি গৃহে ভ্রষ্টাচার, অসংযম ও অনিয়ম অকুতোভয়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে—তাই আজ কাহারও গৃহে অন্ন নাই—কাহারও শরীরে সামর্থ্য নাই—কাহারও মনে সুখ নাই,—হৃদয়ে উৎসাহ নাই! অশান্তি রোগ দুর্ভিক্ষ—ভারতের গৃহে গৃহে ক্রীড়া করিয়া ফিরিতেছে! আমার বিশ্বাস আবার যদি আমরা আশ্রমচতুষ্টয়ের নিয়ম মান্য করিয়া চলিতে পারি—বর্ণ বিহিত অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত পালন করিবার চেষ্টাকে উদ্বোধিত করিতে পারি তবে আবার একদিন ভারতের সৌভাগ্যাকাশ, ভারতের অতীত গৌরব মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রিকার ন্যায়, বরষাপগমে ঘনকৃষ্ণ মেঘমালাবিরহিত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শারদযামিনীর ন্যায় আপনার শুভ্র কিরণগৌরবে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিতে পারে। ভারতবাসীরা আবার জ্ঞানে ধর্ম্মে পুণ্যে ধন্য হইতে পারেন।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ" ॥
"গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্ম চৌড় মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে" ॥

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া স্তুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ" ॥ ২য় অঃ

"বৈদিক পুণ্য কার্য্য দ্বারা দ্বিজাতিগণের গর্ভধানাদি শরীর সংস্কার করা কর্ত্তব্য। এই সকল বৈদিক সংস্কার ইহকালে ও পরকালে পবিত্রতা বিধায়ক। গর্ভ কালীন গর্ভধানাদিসংস্কার, জাতকর্ম্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দ্বিজাতিগণের বীজ ও গর্ভ জন্য পাপ সমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে॥ বেদত্রয়ের অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত, সায়ংপ্রাতর্হোম, ব্রহ্মচর্য্য সময়ে দেব, ঋষি, পিতৃতর্পণ, গৃহস্থাশ্রমী হইয়া সন্তানোৎপাদন, ব্রহ্মযজ্ঞাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও জ্যোতিষ্টোমাদি অপরাপর যজ্ঞ;—ইহারা এই মানব দেহকে ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপযুক্ত করে"।

উপস্থিত তাং ২২-৫-১৫

আশ্রমচতুষ্টয়।

প্রথম কাণ্ড।

ব্রহ্মচর্য্য।

প্রথম অধ্যায়।

উপনয়ন।

ব্রহ্মচর্য্য সকল আশ্রমের ভিত্তিভূমি। ব্রহ্মচর্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে অন্যান্য আশ্রমের কর্ত্তব্য পালনও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কর্ত্তব্যাদি আমরা একটু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

উপনয়ন সংস্কারের সঙ্গে দ্বিজাতিবর্গের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের আরম্ভ।

উপনয়নের উদ্দেশ্য।

উপনয়ন সংস্কৃত হইলে বুঝিতে হয় বালকের শিক্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে—বালককে গুরুসন্নিধানে গমন করিয়া যথাবিহিত অধ্যয়নাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে—উপনয়ন সংস্কার তাহাই সূচনা করিতেছে। উপনয়ন

শব্দের ধাতুঘটিত অর্থ হইতেও ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আজ কাল উপনয়ন সংস্কার একটি অনাবশ্যক আড়ম্বর পূর্ণ বাহ্যব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য অভিভাবক বা উপনীত বালক কেহই অধুনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না—সুতরাং সংস্কারের যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা ব্যর্থ হইতেছে।

উপনয়নের কাল।

উপনয়নের পর হইতেই যে গুরুগৃহে বাস করিতে হয় উপনীত বালকের বয়স হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মনু বলিয়াছেন সাধারণতঃ গর্ভাষ্টম, গর্ভ একাদশ ও গর্ভ দ্বাদশ বৎসরে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন বিধেয়—কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মতেজঃকামী, অথবা বলার্থী অথবা ধনকামী এবম্ভুত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বালকদিগের জন্য মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন ঃ—

"ব্রহ্মবর্চ্চস কামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে॥ ২য় অঃ।

"প্রকৃষ্ট ব্রহ্মতেজঃকামী ব্রাহ্মণের, বলার্থী ক্ষত্রিয়ের এবং ধনকামী বৈশ্যের—যথাক্রমে গর্ভ পঞ্চম, গর্ভ ষষ্ঠ ও গর্ভ অষ্টম বৎসরে স্ব স্ব বালকের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য"।

ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের গর্ভ দ্বাবিংশ এবং বৈশ্যের গর্ভ চতুর্বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিলে ইহাদিগকে উপনয়নভ্রষ্ট হইতে হয়—এবং তাদৃশ বালকেরা ব্রাত্য মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহারা যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে ইহাদের সহিত কোনরূপ ব্যবহার বা সম্বন্ধ রাখিতে মনু পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন।

কিন্তু মহামান্য মহর্ষি মনুর এই নিষেধ বাক্য কয়জন হিন্দু প্রতিপালন করিয়া থাকেন! আজকাল অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহার যথার্থ তথ্য অবগত হইতে না পারিয়া অযথা ইহার নিন্দাবাদ করেন মাত্র। নিজ বর্ণাশ্রম ও অধিকারের বহির্ভূত ধর্ম্মাচরণেই আজকালকার অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায় সুতরাং মহর্ষির এ ধ্যানলব্ধ গম্ভীর বাক্যের মর্ম্মার্থ কে উপলব্ধি করিবে? যাঁহারা যথার্থ মুমুক্ষু, ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয়ের জন্য যাঁহারা সমিধপাণি, হইয়া গুরুগৃহে গমন করিতেন—ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তর প্রাপ্তির হেতু অবিদ্যার কবল হইতে যাঁহারা পরিত্রাণ লাভেচ্ছু হইয়া বিনীত অন্তঃকরণে গুরুসন্নিধানে প্রণত হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইতেন— তাঁহারাই এই ভবসাগর পারের তরণী স্বরূপ সদাচারকে বহুমান্য করিয়া সেই অলোভী, অনলস, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আপনাদের জন্ম জীবন সার্থক করিতেন। আমার বিশ্বাস এই প্রকার শ্রদ্ধালু সজ্জনবর্গের এখনও নিতান্ত অভাব হয় নাই। তাঁহাদের একজনেরও যদি ইহাতে উপকার হয়—একজনেরও যদি মনুকথিত সদাচারের প্রতি দৃঢ়প্রযত্ন আসে তবে এই প্রবন্ধ লেখা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—o—

উপবীত কেন আমাদিগকে ধারণ করিতে হয় তাহার মোটামুটি উদ্দেশ্য আমরা উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু পূজ্যপাদ ঋষিদিগের যে ইহার মধ্যে কতটা অন্তর্লক্ষ্য ছিল এবং তাঁহারা বালকের চিত্তবৃত্তির গতি কোন দিকে ফিরাইয়া দিতেছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। অনেকে মনে করেন যে কয়েক গাছি সূত্র ধারণ ও কতক গুলি মন্ত্রোচ্চারণ করিলেই বুঝি উপবীত গ্রহণের সার্থকতা হইল। অবশ্য আজকালকার ভাবগতিক দেখিয়া এতদপেক্ষা কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য সহসা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না বটে কিন্তু বাস্তবিকই ইহার মধ্যে বালকের ভবিষ্যৎ জীবনের যে ইঙ্গিত রহিয়াছে তাহা বুঝিলেই আর ইহাকে অনাবশ্যক একটা অনুষ্ঠান বলিয়া মনে হইবে না। ব্রহ্মোপনিষদের উপবীত ধারণের মন্ত্র গুলি একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক তাহা হইলে ইহার গূঢ়ার্থ অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিব। উপনিষৎ বলিতেছেন :—

উপনয়নের বাহ্যিক ও অন্তর্লক্ষ্য বেদসম্মত উদ্দেশ্য

"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ" ॥

হৃদয়ে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য বিরাজ করিতেছেন এই শুভ্র যজ্ঞো-পবীত তাহার স্মারক—সেই জন্য যজ্ঞোপবীত হৃদয়ের উপরিদেশে

ধারণ করিতে হয়। "এই যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের তেজ ও ব্রহ্মবর্চ্চসাদি প্রদান করুক"—এই প্রার্থনার অর্থ এই—যদি আমরা হৃদয়স্থিত চৈতন্যকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি তবে আমরা ব্রহ্মতেজ দ্বারা পবিত্র হই। এই "যজ্ঞোপবীতের" আর একটী অর্থ "জীবাত্মা" (যজ্ঞস্য বিষ্ণোঃ পরমাত্মানং উপ-সামীপ্যেন বীতং —বিবিধ ভাগং—তং জীবস্বরূপং)।

শরীরে তেজ এবং জ্ঞানরূপে জীবাত্মারই প্রকাশ দেখিতে পাই—জড় শরীরের সহিত অনেকটা অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশ্রিত বলিয়া তাঁহাকে দেহ হইতে পৃথক বলিয়া মনে করা যায় না—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত (আত্মা) সমুৎপন্ন বলিয়াই মনে হয়—কিন্তু যিনি এই পবিত্র তেজের আরাধনা করেন তিনি ইহার শক্তি অনুভব করিতে পারেন। প্রথম প্রথম শরীর হইতে শরীরীকে পৃথক করিয়া অনুভব করা যায় না কিন্তু সাধনার প্রভাবে যতই শক্তির প্রকাশ হইতে থাকে ততই দেহ হইতে দেহীর পার্থক্য স্পষ্ট হইয়া উঠে—তখন তাহা কেবল চিন্ময় শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে—এই চিন্ময় বস্তুই মনুষ্যের মধ্যে আসল মানুষ (inner man) সারাৎসার শ্রেষ্ঠ বস্তু—আয়ুঃ-স্বরূপ, সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আয়ুঃরূপিণী চিন্ময়ী-শক্তির আরাধনা করিয়াই দ্বিজাতিরা সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভ করিতেন। এই আত্মা শুভ্র, নির্ম্মল, ও উজ্জ্বল পদার্থ (?)। ইহার উপাসনা করিয়াই শিষ্যেরা বল ও তেজ লাভ করিতেন এবং ইহাই ব্রাহ্মণের সাবিত্রী উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

"যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম তৎ সূত্রমিতি ধারয়েৎ।
অন্তর্লক্ষ্য। সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরমপদং" ॥

শিষ্য বহিঃসূত্র ধারণ করিয়া পরে কোন সূত্র ধারণ করিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিবে বেদ তাহারই উপদেশ দিতেছেন—অবিনাশী পরব্রহ্মস্বরূপ এই সূত্র ধারণ করিবে, এই পরব্রহ্ম ব্রহ্মসূত্র দ্বারা সূচিত হইয়াছেন—সেই পরম পদই সূত্র। অর্থাৎ এই দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যকে আমরা ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্নার মধ্যে উপলব্ধি করি—সেইখানে ব্রহ্মের সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় পরম শুভ্র রূপের সাক্ষাৎকার হয়—সেইজন্য সুষুম্নাকে ব্রহ্মনাল বা ব্রহ্মসূত্র বলিয়া যোগীরা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সুষুম্না মার্গেই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ অনুভব হয় এবং এইখানেই "তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং" রূপের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং যে ভাগ্যবান পুরুষ এই পরম রূপ আপনার হৃদয়গুহার মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার "আপন স্বরূপের" পরিচয় পাইয়াছেন—তিনি আর এই "মিথ্যা আমির" মোহে ভুলিয়া আপনাকে আর বৃথা বিড়ম্বিত করেন না। তাঁহার জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত কর্ম্মরাশি সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেই জন্যই শাস্ত্র ইহাকে "সূত্র" বলিয়াছেন এবং এই "সূত্র"কে পরম পদও বলিয়াছেন। কারণ এই সূত্রকে যিনি জানিতে পারেন তিনি ইহাঁরই মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত দেখিতে পান এবং "মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা" তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞানের গোচরীভূত হয়। যাঁহার চিত্ত সাধনবলে ঐখানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তিনিই বিষ্ণুর পরমপদকে প্রাপ্ত হ'ন। তাহার পূর্ব্বে কোন জ্ঞানের কথা বলিতে

যাওয়া বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে লৌকিক যুক্তির দ্বারা বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র হয়। উপনিষদও বলিয়াছেন ঃ—

"তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ।
তেন সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব" ॥

এই সূত্রকে যিনি জানিতে পারেন তিনিই বেদপারগ। সূত্রে যেমন মণি সমূহ গ্রথিত থাকে তেমনি এই ব্রহ্মসূত্রে সমস্ত গ্রথিত রহিয়াছে—ইহারই সাধন করুণানিধান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন।

"তৎ সূত্রং ধারয়েৎ যোগী যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান"।

যোগবিৎ তত্ত্বদর্শী মহোদয়গণ এইরূপ ব্রহ্মসূত্র ধারণ করেন। ইহারই জন্য বাহ্য উপনয়ন—ইহারই জন্য শিক্ষা, দীক্ষা, ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন। পরে "তত্ত্ব" যখন প্রত্যক্ষ হইবে তখন বাহিরের সূত্র রাখ বা না রাখ—তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উপবীত ত্যাগ বিড়ম্বনা মাত্র। যিনি বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবার অধিকারী হইয়াছেন তিনিও যতদিন গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেন ততদিন উপবীত পরিত্যাগ করিবেন না। যে হেতু অল্পধী ব্যক্তি তাঁহার বৃথা অনুকরণ করিতে গিয়া ইহ পরত্র হইতে ভ্রষ্ট হইবে মাত্র—সেই জন্যই গীতার এই মহান উপদেশ। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্"। কিন্তু "অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা" আমরা—আমাদের এ উপদেশ আর ভাল লাগে না!! শাস্ত্র কোন সময়ে উপবীত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন দেখুন—"বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ" অর্থাৎ উত্তম যোগযুক্ত হইয়া যখন ভেদজ্ঞান

তিরোহিত হইবে তখন বহিঃসূত্র পরিত্যাগ করিবে। এই অন্তর্যজ্ঞোপবীতের জন্যই আমাদের জীবনব্যাপী আয়োজন, আচার, বিচার, নিয়ম, নিষ্ঠা। কিন্তু যাঁহারা লক্ষ্যকে ভুলিয়া কেবল আচার, বিচার, নিয়ম, নিষ্ঠা লইয়া সময়পাত করেন—তাঁহারা "পথ"কেই সেবা করেন, কিন্তু "পথ" দ্বারা যেখানে পৌঁছিতে হয়—যাহাতে প্রবেশ করিতে হয়—সেই পরাৎপরকেই তাঁহারা ভুলিয়া যান।

"ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ।
ধারণাত্তস্য সূত্রস্য নোচ্ছিষ্টো না শুচির্ভবেৎ ॥"
"সূত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞোপবীতিনাম্।
তে বৈ সূত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥"

"ব্রহ্মভাবময় এই সূত্র যিনি ধারণ করেন তিনিই চেতনাবান। এই সূত্র যিনি ধারণ করিতে পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে উচ্ছিষ্ট বা অশুচিতা নাই। যে জ্ঞানযজ্ঞোপবীতশালী ব্যক্তি এই অধ্যাত্ম অন্তর্নিহিত সূত্র ধারণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সূত্রবিদ এবং যজ্ঞোপবীতধারী"।

"ইদং যজ্ঞোপবীতন্তু পরমং যৎ পরায়ণম্।
স বিদ্বান যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ স যজ্ঞঃ স চ যজ্ঞবিৎ" ॥

"এই পরম জ্ঞান-যজ্ঞোপবীতই যাঁহার আশ্রয়, সেই বিদ্বান ব্যক্তিই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতধারী,—তিনি বিষ্ণু স্বরূপ এবং বিষ্ণুবিদ্। বেদেই বলিয়াছেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই ব্রহ্মবিদই প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং এই ব্রাহ্মণের পদরজতে যথার্থই পৃথিবী পবিত্র হয়।

সন্ধ্যা ও উপাসনা।

দ্বিজাতিরা প্রত্যহ "আপোহিষ্ঠাদি" মন্ত্রে যে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া থাকেন তাহাও বহিঃসন্ধ্যা কিন্তু ইহাও অকরণীয় নহে কারণ বহিঃসন্ধ্যা-দ্বারা দেহ, মন পবিত্র হইলে তবে অন্তঃসন্ধ্যার গূঢ়ার্থ লক্ষিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিয়াছেন ঃ—

"যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥"

আত্মার ধ্যানকেই সন্ধ্যা বলে। যে সময়ে বুদ্ধি বা কৌশল দ্বারা জীব ও পরমাত্মার মিলন স্থাপনের জন্য ধ্যান করা যায় তাহাকে সন্ধ্যা বলে; সুতরাং আত্মধ্যানই সন্ধ্যা শব্দের লক্ষ্য। অতএব সন্ধ্যা বন্দনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সন্ধ্যা "নিরোদকা-ধ্যান-সন্ধ্যাবাক্কায়ক্লেশবর্জ্জিতা"। ইহাতে জলের প্রয়োজন নাই, মুখের বা কায়ার ক্লেশ নাই। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা কবির সাহেব বলিয়াছেন ঃ—

"কবির মালা জপ না করো জপ মুখতে কহনা রাম।
মন্ মেরা সুমিরণ করে ময় পায়ে বিশ্রাম॥
কবির মন মালা সদ্‌গুরু দেই, পওন সুরতিতে পোয়ে,
বিনু হাতে নিশিদিন্ ফিরে, ব্রহ্ম জপ তাঁহা হোয়ে॥

এই ব্রহ্মকে জানিতে বাক্য মন হারিয়া যায়। দেহাত্মবুদ্ধিজড়িত আমাদের এই বিকৃত মন তাঁহার কোন সন্ধানই পায় না। "যন্মনসা ন মনুতে"। তাঁহাকে পাইতে হইলে এই চঞ্চলা মনকে মন্থন করিয়া তবে সেই চিরস্থির, চিরনির্ম্মল আত্মাকে উপলব্ধি

করিতে পারা যায়। তখনি আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। জীবাত্মা এখন তো মায়াপুরীর মধ্যে বাসনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছেন—এখানে এই দেহ, ইন্দ্রিয় সকলই তাঁহার বিপক্ষ। জীবাত্মা যখন প্রাণভয়ে এই মায়াপুরী হইতে মুক্তি পাইবার আশায় ভূমানুসন্ধানে রত হন তখনি তিনি আপনার জীবননাথকে দেখিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন। "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা"। এই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপই "আনন্দ"। তিনি এই আনন্দঘনরূপে, অমৃতরূপে সমস্ত জগৎ ভরিয়া দুগ্ধে ঘৃতের অবস্থানের ন্যায় সর্ব্বত্র সূক্ষ্মভাবে ব্যাপিয়া আছেন "সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম"। কিরূপে এই ক্ষীর হইতে ঘৃতকে প্রকাশ করিতে পারা যায় তাহার উপদেশ উপনিষদেই আছে ঃ—

"আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥"

আত্মাকে অরণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস দ্বারা প্রকাশমান আত্মাকে নিগূঢ়ভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায়॥

তৃতীয় অধ্যায়।

—*০*—

উপনীতের কর্ম্মযোগ।

উপনীত হইলেই বালককে ব্রহ্মচারী বলা হয়। ইহাই চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম। ইহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মচারী বল, আরোগ্য, বিদ্যা, যশ ও অর্থ লাভ করেন এবং তখনি ইনি গৃহপ্রবেশের উপযুক্ত হন।

ব্রহ্মচারী।

"ন হ্যস্মিন যুজ্যতে কর্ম্ম কিঞ্চিদা মৌঞ্জি বন্ধনাৎ॥
নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানি নয়নাদ্রিতে।
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে॥
কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্॥"

উপনয়নের পূর্ব্বে দ্বিজাতিগণের শূদ্রত্ব ও বেদে অনধিকার।

"উপনয়নের পূর্ব্বে শ্রৌত স্মার্ত্ত কোন কর্ম্মে অধিকার থাকে না॥ উপনয়নের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধীয় মন্ত্র ব্যতিরিক্ত কোন বেদ উচ্চারণ করিতে নাই। যতদিন না ব্রহ্ম জন্ম হয়, ততদিন দ্বিজগণ শূদ্রের সমান থাকেন॥ কৃতোপনয়ন হইলে পর তবেই দ্বিজগণের প্রতি ত্রৈবিদ্যাদি, অথবা মধুমাংস বর্জ্জনাদি ব্রত সমূহের আদেশ এবং বিধিপূর্ব্বক বেদগ্রহণের ভার অর্পিত হয়"॥

গুরু ব্রহ্মচারীকে প্রথমতঃ যাহা শিক্ষা দিবেন।

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ"॥

"অধ্যেষ্যমাণস্ত্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ।
ব্রহ্মাঞ্জলিকৃতোহধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ" ॥
"ব্রহ্মারম্ভেহবসানে চ পাদৌ গ্রাহ্যৌ গুরোঃ সদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি" ॥
"ব্রাহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
সংহত্যহস্তাবধ্যেয়ং স হি ব্রহ্মাঞ্জলিঃ স্মৃতঃ" ॥

মনু দ্বিতীয় অধ্যায়।

"গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমতঃ তাহাকে আদ্যোপান্ত শৌচ ক্রিয়া শিক্ষা দিবেন; আচার, অগ্নিপরিচর্য্যা, এবং সন্ধ্যোপাসনাও শিখাইবেন ॥ অধ্যয়ন করিবার জন্য শিষ্য শাস্ত্রানুসারে আচমন করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া পবিত্র বেশে উপবেশন করিলে, গুরু তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেন। বেদাধ্যয়নের আরম্ভ এবং অবসান কালে শিষ্য প্রতিদিন গুরুর পদদ্বয় গ্রহণ করিবেন এবং অধ্যয়নকালে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরু সমীপে অবস্থান করিবেন। অধ্যয়নকালের এই কৃতাঞ্জলিকে ব্রহ্মাঞ্জলি বলে ॥ বেদাধ্যয়নের আরম্ভে ও সমাপনে ব্রাহ্মণ প্রণব উচ্চারণ করিবেন। প্রথমে প্রণবোচ্চারণ না করিলে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায় এবং অধ্যয়নাবসানে প্রণবোচ্চারণ না করিলে সমুদায় বিস্মৃত হইতে হয়"॥

ব্রহ্মচারী এক প্রহর রাত্রি থাকিতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবেন। শৌচাদি সমাপনান্তে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া শুচি হইয়া প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক বেদাভ্যাসে ও অধ্যয়নে আপনাকে নিযুক্ত

করিবেন। পাঠ সমাপনান্তে আপনার গৃহাদি মার্জ্জনাপূর্ব্বক স্নানার্থ কোন স্রোতঃস্বতী অথবা বৃহৎ পরিচ্ছন্ন জলাশয়ে গমন করিবেন। অবগাহন স্নান করিয়া অরুণোদয়ের কাল হইতেই সন্ধ্যা, গায়ত্রীর উপাসনায় নিযুক্ত হইবেন। পরে পাঠার্থী হইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন।

ব্রহ্মচারীর অধ্যয়ন ও গুরুর প্রতি বিহিত সম্মান প্রদর্শন।

"চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্য্যস্য হিতেষু চ" ॥

"গুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হউন বা অনাদিষ্ট হউন ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়নে ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান হইবেন"।

"শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্" ॥
"নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ" ॥
"হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ" ॥
"প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ" ॥
"আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্য ত্বব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ" ॥
"পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যেত্য চান্তিকম্।
প্রণম্য তু শয়ানস্য নিদেশে চৈব তিষ্ঠতঃ" ॥

"নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ" ॥
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্।
নচৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্" ॥
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোহন্যতঃ" ॥

মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

"প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। উত্তরীয় হইতে দক্ষিণ হস্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিদিন শোভনভাবে বস্ত্রাবৃত দেহ হইয়া, গুরু "উপবেশন কর" বলিয়া অনুমতি দিলে তাঁহার অভিমুখে উপবেশন করিবেন। সর্ব্বদা গুরু সন্নিধানে গুরু অপেক্ষা হীনান্ন-বস্ত্র-বেশ হওয়া উচিত; গুরু যখন উঠিবেন তাহার অগ্রে উত্থান করা ও গুরু যখন শয়ন করিবেন তাহার পরে শয়ন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া ভোজন করিতে করিতে কিম্বা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অথবা অন্যদিকে মুখ করিয়া গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ অথবা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই। গুরু যদি আসনে বসিয়া আজ্ঞা করেন শিষ্য উত্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন। এইরূপে গুরু উত্থিত অবস্থায় আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কয়েকপদ গমন করিয়া—গুরু আগমন করিতে করিতে অনুমতি দিলে শিষ্য তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিয়া এবং গুরু দ্রুত গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া—তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ বা তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবেন। গুরু অনন্যমুখীন হইয়া থাকিলে শিষ্য সম্মুখীন হইয়া, গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য নিকটস্থ হইয়া এবং গুরু শয়ন অথবা নিকটে অবস্থান করিলে অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে হয়। গুরু সমীপে শিষ্যের আসন ও শয্যা সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষা অনুন্নত হওয়া উচিত। গুরু দেখিতে পান এমন স্থানে শিষ্যের যথেচ্ছা করচরণাদি প্রসারণ করিয়া উপবেশন করা উচিত নয়। গুরুর অসাক্ষাতেও পূজাবচনশূন্য কেবলমাত্র গুরুর নাম উচ্চারণ করিতে নাই কিম্বা উপহাস বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদি অনুকরণ করা উচিত নয়। যথায় গুরুর পরীবাদ অথবা নিন্দা হয় তথায় হস্তাদি দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন অথবা তথা হইতে অন্যত্র গমন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য" ॥

এই সব নিয়ম আজ কাল আর আমরা মানিয়া চলি না। অবশ্য বাহিরে সম্মান প্রদর্শন যদিও এখনও বিরল নহে কিন্তু গুরুর পরীবাদ এবং নিন্দা করিতে ছাত্রদিগের আজ কাল কোন শঙ্কাই দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুকে ঠাট্টা এবং পিছন হইতে বগ দেখানো এবং তাঁহার সম্মুখে নানাবিধ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে এখনকার ছাত্ররা আর সঙ্কুচিত হয় না। এই সকল আচার ব্যবহার দেখিলে বাস্তবিকই আমাদের চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। ইংরাজেরাও তাঁহাদিগের অধ্যাপকদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া থাকেন কিন্তু দুর্ব্বলেন্দ্রিয় আমাদের তাহাতে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। এই সকল চরিত্রগত ও আচারগত হীনতা যতদিন আমরা ধুইয়া মুছিয়া

ফেলিতে না পারিব ততদিন আর্য্যশিক্ষাদীক্ষার সমুজ্জ্বল কিরণ আমাদের অজ্ঞানতমঃকে কিছুতেই ধ্বংস করিতে পারিবে না। আমাদের শাস্ত্রে গুরুকে পিতা অপেক্ষা বড় বলিয়াছেন—"গুরু-র্বিশ্বেশ্বরঃ সাক্ষাৎ তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং"।

শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু।

অবশ্য বর্ত্তমান কালে বৈদিক যুগের মত শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু—উপাধ্যায় ও আচার্য্য আর একই ব্যক্তি হইতে পারেন না। নানা কারণে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত ও বিভিন্নমুখী হইয়া পড়িয়াছে। দীক্ষাগুরুকে এখনও অনেকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। উপরোক্ত শ্লোকটি দীক্ষাগুরুকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। কিন্তু ক্রমশঃই দীক্ষাগুরুর সম্মানও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আমাদের দুরদৃষ্ট!!

ভিক্ষা, সমিধ আহরণ ও হোম।

শিষ্য প্রতিদিন আচার্য্যের প্রয়োজন মত জল, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা এবং কুশ আহরণ করিবেন এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন। এই ভিক্ষা নির্ব্বিচারে সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করিবার বিধি নাই। যে সকল গৃহস্থ বেদবিহিত অনুষ্ঠানে অনুরক্ত, যাঁহারা স্ব স্ব বৃত্তিতে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া কালযাপন করেন—তাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন শুচিগৃহস্থের নিকট হইতে ব্রহ্মচারী ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। গুরুর কুলে অথবা আত্মীয় স্বজনের নিকট ভিক্ষা করিবার বিধি নাই, কারণ স্নেহপরবশ হইয়া অধিক অন্ন ব্রহ্মচারীকে দিলে ব্রহ্মচারীর আর ক্লেশ স্বীকার করিয়া বহু গৃহস্থের নিকট

যাইবার প্রয়োজন হয় না এবং সকলের দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করিবার হীনতাকে আর স্বীকার করিবারও প্রয়োজন হয় না, সুতরাং শিষ্যকে ভিক্ষা করাইবার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়া যায়। সেইজন্য সেকালের গুরুরা শিষ্যকে ওরূপ মুক্তি দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। ইহাতে শিক্ষার একটি বিশেষ ত্রুটী থাকিয়া যায়। আমি যে সকলের চেয়ে দীন হীন—আমি যে যথার্থ কাঙাল ভিখারী—এটি উপলব্ধি হওয়া নিতান্তই আবশ্যক; নচেৎ আমাদের এই গর্ব্বিত, উদ্ধত চিত্ত কিছুতেই মদীয় মস্তককে অবনত করিতে চাহে না। বিশেষতঃ যৌবনের প্রথমারম্ভ হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা ঠিক হ্রী নহে—ভাবিয়া দেখিলে তাহাকে অভিমানেরই রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হইবে। এই অভিমান থাকিতে আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি না—তাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ—আপনার অভিমান গর্ব্বকে খর্ব্ব করিবার প্রয়াস—ইহা আর্য্যমস্তিষ্ক-সম্ভূত শিক্ষার একটি অপূর্ব্ব অভিনব প্রণালী। সোনার গৌরাঙ্গ তাই তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে "তৃণাদপি সুনীচেন"র উপদেশ দিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন ঃ—

> "সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
> অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা"॥

"ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে যাবজ্জীবন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন, এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন"।

তা ছাড়া দীন, অনাথ যাচকদের যে কি কষ্ট তাহা বুঝিবার ইহা একটি সুন্দর সুযোগ এবং তাহাদের প্রতি সাহাঁনুভূতি উদ্রিক্ত হইবার ইহাও একটি সুন্দর কৌশল।

ভিক্ষাদাতা সদ্‌গৃহস্থের যদি একান্ত অভাব হয় তবে ব্রহ্মচারী মৌনী হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের নিকটেই ভিক্ষা করিবেন। যাহারা অভিশপ্ত বা মহাপাতকযুক্ত তাদৃশ গৃহস্থের নিকট ব্রহ্মচারী ভিক্ষার্থ গমন করিবেন না। ভিক্ষাচরণ ব্রহ্মচারীর প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য হইলেও তিনি একই গৃহস্থের নিকট প্রতিদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন না। উপরোক্তরূপ ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবিকা সংগ্রহকে ঋষিরা উপবাসের ন্যায় পুণ্যজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীর আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য সমিধকাষ্ঠ আহরণ। বহুদূর বনান্তর হইতে এই সমিধকাষ্ঠ আহরণ করিয়া অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন এবং সায়ং প্রাতে নিরলস হইয়া সেই সমিধকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিতে হোম ব্রহ্মচারীর প্রা ত্যহিক কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল।

অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রহ্মচারী যদি সুস্থ অবস্থায় নিরন্তর সপ্তরাত্রি ভিক্ষাচরণ ও সায়ং প্রাতে সমিধ কাষ্ঠ দ্বারা হোম না করেন তবে তাঁহাদিগকে "অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত" গ্রহণ করিতে হইত। যাঁহারা ব্রহ্মচারী তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যব্রত হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্খলিত হইলে তাঁহাদিগকে অবকীর্ণি বলে। অবকীর্ণ পাপগ্রস্তের জন্য নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্ত মনু ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভাজিনম্।
সপ্তাগারাংশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং স্বকর্ম্ম পরিকীর্ত্তয়ন্॥

তেভ্যো লব্ধেন ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়ন্নেককালিকম্।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং ত্বব্দেন স বিশুদ্ধতি" ॥

গুরুকুলে বাসকালীন ব্রহ্মচারী ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক আত্মগত অদৃষ্ট বৃদ্ধির জন্য নিম্ন কথিত নিয়ম সকল প্রতিপালন করিবেন।

তর্পণ, সংযম তপস্যা।

"নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেবচ" ॥
"বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং" ॥
"অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্" ॥
"দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ" ॥
"একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ" ॥
"স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিঃ পুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ" ॥

২য় অঃ মনু।

"ব্রহ্মচারী প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধ ভাবে দেব, ঋষি ও পিতৃ তর্পণ করিবেন; দেবতাদিগের পূজা করিবেন এবং সায়ং প্রাতে সমিধ দ্বারা হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবেন না; গন্ধ দ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতি

রস গ্রহণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না; যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণ বশে অম্ল হয়, দধি প্রভৃতি সেই সমুদায় শুক্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবেন এবং প্রাণিহিংসা করিবেন না। তৈল দ্বারা সমস্তক সর্ব্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষু রঞ্জন, পাদুকা বা ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও নৃত্য, গীত, বাদন, অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দেশ বার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যা-কথন; কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টাচরণ, ব্রহ্মচারী এ সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন। সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবেন এবং হস্ত ব্যাপারাদি দ্বারা কদাচ রেতঃপাত করিবেন না। কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নদোষেও রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে তিনি স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবেন এবং "পুনর্ম্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ম্" অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক; ইত্যাদি বেদমন্ত্র বারত্রয় জপ করিবেন"।

মনুর এই মহাশাসন বাক্য ক'টিতেই ব্রহ্মচারীর লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদিও আর কিছু বলা অনাবশ্যক, তথাপি দু একটি কথা ব্রহ্মচারীর স্মরণার্থ লিখিতে বাধ্য হইলাম। বালকদিগকে আরামের মধ্যে রাখিয়া আজকালকার পিতামাতা আপনাদের সন্তানদিগকে প্রতিদিন শরীরে ও মনে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন—জুতা, হাট, প্যাণ্ট, মখমলের জামা, মোজা, টুপি, ফ্ল্যানেলের চাপে তাহাদিগকে একটি ক্ষীণপ্রাণ ননির পুতুলের মত

করিয়া তুলিতেছেন—এই সব আরামপালিত সহজসুখাভ্যস্ত বালক-বৃন্দ কি এই সংযমের মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে? এই কঠোরতার কথা শুনিয়া হয়ত তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে। তাই আমি সমস্ত জনক-জননীর কাছে কর জোড় করিয়া নিবেদন করিতেছি যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদিগকে এই সংযমের কঠোরতার মধ্যে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে না দেন, তবে যেন তাঁহারা সেই সকল সন্তানের নিকট হইতে কিছু আশা না করেন। কারণ, যে শরীর শিশুকাল হইতে সুখভোগ করিতে করিতে জীবনের সমস্ত শুভকর্ম্ম হইতে আপনাকে অযোগ্য করিয়া ফেলিতেছে, যে এক মাইল হাঁটিতে হইলে চোখে অন্ধকার দেখে, রেলগাড়ি হইতে দশ সের মাত্র পুটুলি নামাইতে হইলে কুলির তোষামোদ করে, একটু রৌদ্র লাগিলে যাহাদের শিরঃপীড়া জন্মে, খাইতে একটু বিলম্ব হইলে যাহাদের মাথা ঘুরিতে থাকে, ভোজনের উপকরণের কিছু মাত্র ত্রুটী হইলে যাহাদের রসনা বাঁকিয়া দাঁড়ায় এবং মন বিদ্রোহ উপস্থিত করে, আমি সেই মনুষ্যের আকার-অবয়ব-বিশিষ্ট জীবিত কাষ্ঠগুলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হই। তাহারাই আমাদের দেশের আশা-ভরসা, এ কথা মনে করিলে আমার পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়, এবং কাহার নিকট এই অভিযোগ, এই প্রাণের বেদনা জানাইব বুঝিতে না পারিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করি, এবং ভগবানকে ডাকিয়া বলি, 'আমাদের জন্য ইহাই কি তোমার বিধান'! যে দেশে সম্রাটের পুত্রদিগকে পর্য্যন্ত তপোবনের পুণ্য-আশ্রয়ে, ঋষিদিগের পাদমূলে বসিয়া এই

কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া অটুট ভাবে দীর্ঘ কাল তাহাই বহন করিতে হইত, তখন বর্ত্তমান যুগের সাধারণ গৃহস্থ এবং তথা-কথিত আমাদের দেশের ধনী সন্তানেরা যে এ কঠোর ব্রত পালনে অসমর্থ হইবেন, তাহা আমার মনে করিতেও লজ্জা হয়।

ভবিষ্যৎ জনক-জননীদের নিকট আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, যে দেশে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভীষ্ম, ও অর্জ্জুন জন্মিয়াছিল,—অম্বরীষ, ধ্রুব, ও প্রহ্লাদ যে দেশকে ভক্তি-প্রেমে পুণ্যময় ও পবিত্রতর করিয়াছিল,—নারদ, শুক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, জনক, ও যাজ্ঞবল্ক্য যে দেশের জ্ঞানদাতা,—সিদ্ধর্ষি কপিল ও অষ্টাবক্র যে দেশের আদর্শ জ্ঞানী, বাল্মীকি ও ব্যাস যে দেশের অমর কবি,—স্বয়ং পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের জ্ঞানগুরু ও উপাস্য,—যে দেশে কুন্তী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, গার্গী, ও মৈত্রেয়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—সে দেশের নরনারীর নিকট হইতে সংযমশিক্ষিত ব্রহ্মচর্য্যে অটল-প্রতিষ্ঠ তপস্তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্তানের আবির্ভাবের আশা করা কি নিতান্ত অসঙ্গত? কখনই নহে!

কিন্তু হে জনক-জননীগণ, আবার তোমরা তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, সংযম অভ্যাস কর—"অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতুং"—পূর্ব্ব পুরুষের এই মহতী শিক্ষার অনুকরণে দৃঢ় প্রযত্ন কর, ঈশ্বরপরায়ণ হও; বাহিরে গোল করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, ভ্রূণহত্যা করিয়া তোমরা কখনই শ্রেয়ঃকে লাভ করিতে পারিবে না!

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী শুদ্ধাচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। যথা, ভোজনের পূর্ব্বে ও বিহিত কর্ম্মের পূর্ব্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন, অন্নাদি ভোজনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মতীর্থ অথবা প্রজাপতি-তীর্থ বা দৈবতীর্থ দ্বারা আচমন ইত্যাদি। আচমনের জল ব্রাহ্মণের হৃদয় পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাঁহারা পবিত্র হন; তাঁহারা এইরূপে পবিত্র হইয়া ভোজন করিতে বসিবেন। ব্রহ্মচারী অন্নকে সমাদরে গ্রহণ করিবেন; তাহা নিন্দা করিবেন না, এরূপ করিলে রসনা অযথা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়, এবং দেহেন্দ্রিয়াদির তৃপ্তি ব্যতীত অন্নের যে আর একটি প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বিস্মৃত হইতে হয়। অতিভোজন রোগবর্দ্ধক ও আয়ুঃক্ষয়কারী, এইজন্য মনু ব্রহ্মচারীর পক্ষে অতিভোজন নিষেধ করিয়াছেন। তিনি মধু, মাংস, গুড়প্রভৃতি রস এবং দধিপ্রভৃতি শুক্তদ্রব্যও ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। এই সকল ভোজনাদি সম্বন্ধে এতটা নিষেধ বিধি প্রচারের মূলে তাঁহার একটা অন্তর্নিহিত মঙ্গল কামনা গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, দেখিতে পাই। ব্রহ্মচারী যদি ব্রহ্মচর্য্যে (শুক্রধারণে) অটলপ্রতিষ্ঠ না হইতে পারেন তবে তাঁহার অধ্যয়নেরও হানি ঘটে, এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভেও তিনি সমর্থ হন না। কারণ যাঁহার শুক্র অন্ততঃ দ্বাদশবর্ষ স্খলিত হয় নাই, এবম্ভূত ব্রহ্মচারীর মস্তিষ্কের সমস্ত পরদাগুলি খুলিয়া যায়, এবং তখনি তিনি যথার্থ ব্রহ্মবিদ্যা-ব্রহ্মজ্ঞান ধারণা করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। আমাদের

শুদ্ধাচার আচমন ও ভোজন।

মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্মতম কেন্দ্র (cell) আছে, সেগুলির মধ্যে শক্তি সঞ্চার হয় না—যদি আমরা স্খলিতবীর্য্য হই। অটুট ব্রহ্মচর্য্য ধারণে শুক্রধাতু যখন ওজঃ ধাতুতে পরিণত হয়, তখনি মস্তিষ্কের সেই সূক্ষ্মতম দ্বারগুলি বিকশিত হইয়া উঠে—তখন সেই মস্তিষ্কে একবার যে জ্ঞান প্রবেশ লাভ করে, আর তাহা বিস্মৃত হইতে হয় না—চিরদিনের জন্য দাগ (impression) বদ্ধমূল থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গায়ত্রীর আরাধনা করিতে করিতে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আমরা উপলব্ধি করি, এই অন্তর্নিহিত শক্তিই ওজঃ ধাতু, ইহা তেজোময়ী ও প্রকাশরূপিণী। বেদে গায়ত্রীর স্তবে দেখিতে পাই ঃ—

"ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং
ধাম নামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ু-রভিভূরোঁ॥"

"হে গায়ত্রি! তুমি দেহের উপাদানভূত ওজোনামক ধাতু; তুমি সহায়ভূত বল; তুমি দৈহিক বল; তুমি দীপ্তিরূপা; তুমি দেবতাগণের তেজোরূপা; তুমি জগৎ ও জগতের আয়ুঃ; তুমি সমস্ত এবং সমস্তের জীবনী-শক্তি; তুমি অভিভূ,—সমস্ত পাপের প্রশমনকর্ত্রী এবং তুমি ওঁকার"।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে—আত্মার সুনির্ম্মল দীপ্তি তখনি ফুটিয়া উঠে, যখন আমরা অস্খলিত বীর্য্যে আপনার মধ্যে এই মহাশক্তিকে উপাসনা করি; এই মহাশক্তিই বল, তেজঃ এবং আয়ুঃ।

এই মহাশক্তির পূর্ণ বিকাশেই মানবের মানবত্ব। এইরূপ

শক্তিমান্ হইয়া তবে আমরা পরমাত্মাকে আত্মার মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে উপলব্ধি করি। যতদিন ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া শক্তিহীন হইয়া থাকিব, ততদিন মানুষের মধ্যে মানুষের কি তেজ আছে তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। তাই বেদ বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

এই পরিপূর্ণ মস্তিষ্ক-লাভই ব্রহ্মচর্য্যের চরম উদ্দেশ্য। ব্রহ্মচর্য্য-বিহীন এখনকার যুবকগণ বহুশ্রুত হইয়াও সেই পরম সত্যকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না, কারণ মস্তিষ্কে সে ধারণাশক্তি জন্মিবার সুযোগ তাঁহাদের হয় নাই। কিন্তু তখনকার ঋষিবালকেরা তপোবনে আচার্য্যদিগের সেবা-শুশ্রূষা ও তাঁহাদের আদিষ্ট কার্য্যতেই আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন, ভূরি ভূরি গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া স্বাস্থ্য, আয়ুঃ ও বল নষ্ট করিতেন না। এদিকে তপস্তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মবিৎ গুরুগণও শিষ্যের অন্তঃশক্তির বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত কর্ণধারের মত তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেন। প্রথম প্রথম গুরুর ক্ষেত্র পরিদর্শন, আলিবন্ধন, গোচারণ ও গোসেবাতেই শিষ্যদিগের অধিক সময় ব্যয়িত হইত। তারপর একদিন সুপ্রভাতে শুচিস্নাত, অস্খলিতবীর্য্য, শ্রীমান্ ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া, শিষ্য যখন গুরুর পাদতলে আসিয়া বিনীত ভাবে উপবেশন করিতেন, তখন সময় বুঝিয়া—অবস্থা বুঝিয়া গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিতেন, এবং সেই একটি দিনের শিক্ষাতেই বালকের চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান অরুণালোকের মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। শিষ্য সেই জ্ঞানালোকে রঞ্জিত হইয়া

চিরদিনকার মত কৃতকৃত্য হইতেন! কিন্তু হায়! সে দিন চলিয়া গিয়াছে, সে মৌনগুরুসেবারত অন্তেবাসী শিষ্যও আর নাই, আর প্রকৃত কল্যাণকামী ব্রহ্মবিৎ কর্ণধারেরও অভাব নিতান্ত অল্প নহে।* তাই লেখা পড়া শিখিয়া আজকাল আমরা মূর্খ হই! বেদান্ত পড়িয়া ত্রিতাপের জ্বালা আরও আমাদের বাড়িয়া উঠে! কারণ, নিয়মপদ্ধতিকে মান্য করিবার আর আমাদের প্রবৃত্তি নাই, ব্রহ্মচর্য্যের সে কঠোর ব্রত পালন করিতেও আর আমাদের সাধ্য নাই! অথচ সকলেই আমরা দেশের উন্নতি চাই, দেশবাসীর কল্যাণ চাই! যদি সনাতন পন্থাকে পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য আড়ম্বরময় পার্থিবতাসর্ব্বস্ব সভ্যতাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহা কিরূপে আমাদের নিজস্ব হইবে, এবং তাহাতে কিরূপে আমরা সুখী ও সার্থক হইব, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

* শিষ্যের সন্তাপহারক গুরুর উদ্দেশ আর পাওয়া যায় না। আজ কাল ভেল্কি দেখাইয়া তথা-কথিত গুরুরা শিষ্যদিগকে কেবল প্রতারণা করিয়া তাহাদের বিত্ত অপহরণ করিতেছেন! আমরা এত দুর্ব্বল—এত কাণ্ডজ্ঞান হীন—এত অন্ধ—এই সকল কপটাচারী অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মাদিগের কার্য্যে বাধা দিই, এরূপ শক্তিও আমাদের নাই। "দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি"—একথা আর মনেও হয় না—অলিতে গলিতে সদ্গুরু! সকলেই আজকাল সিদ্ধপুরুষ, সকলেই আজকাল অবতার। মেরুদণ্ডহীন আমরা তাহাই বিশ্বাস করিতেছি! এত জড়তা, এত অজ্ঞতা! এদেশের উপায় কি!

চতুর্থ অধ্যায়।

০*০-

ব্রহ্মচারীর সন্ধ্যোপাসনা।

সন্ধ্যোপাসনা সম্বন্ধে যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে কিছু বলা হইয়াছে, তথাপি এ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য আছে; সেই গুলি এ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বলিব।

উপনয়নের সময়েই ব্রহ্মচারীর গায়ত্রী দীক্ষা হইয়াছে; এই সময় হইতে তাঁহাকে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক এই গায়ত্রীর উপাসনা করিতে হইবে। গায়ত্রী উপাসনা করিতে করিতে হৃদয় নির্ম্মল হয়; ভগবানের বিশ্বব্যাপক ভাব, এবং তিনি যে বিশ্বাত্মা, ও সেইজন্য জগতের কেহই যে আমাদের "পর" নয়, এইটি দৃঢ় প্রত্যয় হয়। গায়ত্রী জপ করিতে করিতে মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হয়, এবং ভগবৎ-পাদপদ্মে ক্রমশঃ ভক্তি ও রতি জন্মে, এবং ইহাতেই জন্ম সার্থক হয়। মনু বলিয়াছেন—প্রাতঃসন্ধ্যা-কালে সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাবিত্রী জপ করিবে, এবং সায়ংসন্ধ্যাকালে নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত আসনে সমাসীন হইয়া জপ করিবে। প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিলে নিশাসঞ্চিত পাপসমুদায় নষ্ট হয়, এবং সায়ংকালে সমা-সীন হইয়া জপ করিলে দিবাকৃত সমুদায় পাপমল ধৌত হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে জপাদির

অনুষ্ঠান না করে, সে শূদ্রের ন্যায় সমুদায় দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হয়।

আমরা এখন যে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করি, তাহাতে আচমন, মার্জ্জন, প্রাণায়াম, পুনর্মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, সূর্য্যোপস্থান, গায়ত্রীজপ, আত্মরক্ষা ও সূর্য্যার্ঘ্যদান এই কয়টি প্রধান বিষয়।

(১) মার্জ্জনের যে কয়টি মন্ত্র আছে, তাহা অত্যন্ত সুন্দর ও সরল; ইহার অন্তর্নিহিত ভাবও খুব উচ্চ। বাহ্য ও অন্তর শুদ্ধির নিমিত্ত পরম পাবন ভগবানের বিশেষ ঐশ্বর্য্য জলের নিকট আত্ম-শুদ্ধির জন্য প্রার্থনা—এখানে তাঁহারা "জলকে" জড় ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তাঁহারা সলিলের মধ্যে পরম দেবতার বরণীয় রূপকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা বলিলেন "ওঁ যো দেবোঽপ্সু...তস্মৈ দেবায় নমঃ"। তাঁহারা শুধু-জলকে প্রণাম করেন নাই—জলের মধ্যে হৃদয়দেবতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রেমভক্তিভরে প্রণত হইয়াছিল। তাঁহারা যে জলের মধ্যে ব্রহ্মশক্তিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা এই মন্ত্রটিতেই বুঝিতে পারা যাইবে :—

"ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং, রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চ্চসা"।

"আজ আমি জলের মধ্যে অবগাহন করিয়াছি, এবং তাহার রসের সহিত অর্থাৎ জলের মধ্যে আনন্দরূপে যে ব্রহ্মশক্তি বিরাজ করিতেছেন, সেই রসের মধ্যে আমি সঙ্গত হইয়াছি। হে অগ্নিস্বরূপ পরম দেবতা! তুমি জলান্তর্বর্ত্তী হইয়া জল রূপেই

আপনাকে প্রকাশ করিতেছ; জল যেমন তোমার তেজের সহিত মিলিয়া এক হইয়া আছে, সেইরূপ তোমার তেজের সহিত আমাকে সংযুক্ত কর'। ইহা কি জলের পূজা? তা ছাড়া কারণসলিলের মধ্যে প্রফুল্ল কমলে যে মহাশক্তি আপনার মহিমা-কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাহার সন্ধান পাইবে কে?—যিনি সাধনবলে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহকে অতিক্রম করিয়া কারণ-দেহে জাগ্রত থাকেন; তিনি সেই শ্বেতশতদলবাসিনী অগ্নিজ্যোতির্ম্ময়ী ব্রাহ্মী শক্তিকে আপনার হৃদয়গুহার মধ্যে অনুভব করিতে পারেন। ব্রহ্মের কারণদেহকে বাহ্য কোন বস্তুর সঙ্গে সঙ্গত করিবার জন্য তাহাকে "বারি" বলা হইয়াছে, কারণ তিনি রসস্বরূপ হইয়া প্রাণরূপে জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন।

(২) প্রাণায়ামের দ্বারা শরীর ও চিত্তের মল নষ্ট হইয়া যায়; মনু বলিয়াছেন—'প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্", অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবে। সুতরাং প্রাণায়াম উপাসনার অঙ্গরূপে গণ্য হইয়াছে।

(৩) আচমনে আমাদের মুখগহ্বর, বাগ্‌যন্ত্র ও তালুর শুষ্কতা নষ্ট হয়। এই সকল যন্ত্র সরস থাকিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, সুতরাং উপাসনা খানিকটা বিঘ্নশূন্য হয়; সেই জন্য আচমন সন্ধ্যাঙ্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ইহার মন্ত্রটি আরও সুন্দর এবং নিগূঢ়ভাবের উদ্দীপক। প্রাতঃসন্ধ্যায় রাত্রিকৃত এবং সায়ংসন্ধ্যায় দিবাকৃত—"মনসা, বাচা, হস্তাভ্যাং, পদ্ভ্যামুদরেণ, শিশ্না"—পাপ সকল হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে,

এবং এই সকল পাপ হৃদয়াকাশস্থিত সূর্য্যজ্যোতির মধ্যে হোম করিবার অর্থাৎ নিঃশেষে দগ্ধ করিবার জন্য বিধি আছে। গীতাতেও দেখিতে পাই ভগবান বলিতেছেন ঃ—

"সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে"॥

অপর কোন কোন যোগী ধ্যেয়কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহাতে মনঃসংযমপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম ও প্রাণাদির কর্ম্মকে তাহাতেই হোম করেন। জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রেও হোমের কথা আছে—

"ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্ত্ব হূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে"॥

সাধনাভ্যাসে দৃঢ় প্রযত্ন হইলে সাধক ব্রহ্মাগ্নির প্রকাশ অনুভব করেন, সেই ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণের চাঞ্চল্য, ও বিক্ষিপ্ত-বিমূঢ় ভাব সকল লয় করিয়া সাধক সমাধিস্থ হন। ইহাই আসল হোম।

(৪) অঘমর্ষণ ঃ—যেমন চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সময় অস্ত্র সকলকে ঔষধবিশেষের দ্বারা ধৌত করিয়া শোধন করিয়া লন, কারণ তাহাতে অস্ত্রের সহিত বাহিরের বিষের ক্ষত মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে না; সেইরূপ অঘমর্ষণ মন্ত্রটি দ্বারাও তাঁহারা এই কার্য্য করিতেন; ইহা কতকটা Hypnotism এর মত, তবে ইহা আপনাকে আপনি Hypnotise করা। এই মন্ত্রটিতে মনে করিতে হয় যে, শরীরস্থ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ হস্তের জলের সহিত আসিয়া মিশিতেছে, তারপর সেই জলকে কল্পিত শিলাখণ্ডে আছড়াইয়া দিতে হয়। এইরূপ প্রত্যহ পাপপুরুষকে মন ও

শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিবার পদ্ধতি অভ্যাস করিতে করিতে শরীর ও মন পাপশূন্য হইয়া যায়। কোন একটা লোককে প্রতিদিন যদি সকলেই "তুই অকর্ম্মণ্য" "তুই অকর্ম্মণ্য" বলে, তবে সে প্রকৃতই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তাহার মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আবার কাহাকেও "তুমি সাধু, তুমি সাধু" বলিতে বলিতে, সে সাধু না হইলেও তাহার মধ্যে সাধুভাব জাগ্রত হইয়া উঠে। সুতরাং মন্ত্রশক্তি দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া যদি প্রত্যহ পাপকে বাহির করিয়া দিয়া আপনাকে আমরা পাপনির্ম্মুক্ত মনে করি, তবে পাপবাসনা ক্রমশঃ কেন অন্তর্হিত হইবে না?

(৫) সূর্য্যোপস্থান:—সূর্য্যোপস্থানও ঠিক অঘমর্ষণের মত। তবে ইহার ভাব আরও উচ্চ। ইহার মন্ত্রগুলি ভক্তিরসাশ্রিত, মনঃপ্রাণবিমুগ্ধকর। কথিত আছে যে, ত্রিকোটি মহাবলশালী কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষস সূর্য্যকে সর্ব্বদা গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে; তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য এই জলাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে হয়। ইহার ভিতরকার কথা এই যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগবাসনার অন্ত নাই, তাই তাহাকে ত্রিকোটি রাক্ষসরূপে কল্পনা করা হইয়াছে; এবং এই বিষয়বাসনা জ্ঞানসূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আবৃত করিয়া আছে। বিষয়বাসনাই অজ্ঞানতমঃ, তাই কৃষ্ণবর্ণ। বিষয়-বাসনারূপ অজ্ঞানান্ধকার অপনীত না হইলে সূর্য্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশ হইবে না। নিজেকে যদি পাপী বলিয়া ধারণা হয়, তবে সেই পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার প্রবল আগ্রহ জন্মে; আপনাকে দীন দরিদ্র বোধ হইলে, তবে তো রাজরাজেশ্বরের

সিংহাসনের সন্নিকটে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পরিত্রাণের জন্য গড়াগড়ি দিব। যতদিন অহঙ্কারে শিরকে উচ্চ করিয়া রাখিব, তাঁহার পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ না করিব, ততদিন আমি যে বদ্ধ—আমি যে অক্ষম, দীন, একথা মনে আসিবে না; ততদিন স্ফীতবক্ষে, অকুতোভয়ে পাপানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকিব। যিনি নিজের অবস্থা বুঝিতে পারেন, তিনিই ভবসাগরের ভীষণ তুফানে ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলেন—

"ওঁ ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥
ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়" ॥ ঋগ্বেদ।

হে ঐশ্বর্য্যশালিন্, নির্ম্মলস্বভাব সূর্য্য! আমি অদীনতা-বশতঃ বিহিত কর্ম্ম করিতে পারি নাই; হে শোভনধনশালিন্, আমাকে দয়া কর—আমাকে সুখী কর! সমুদ্র-জলরাশির ন্যায় অসীম ব্রহ্মানন্দসাগরে অবস্থিত হইয়াও আমায় তৃষ্ণা পাইতেছে—বাসনা মিটিতেছে না। তুমি দয়া করিয়া আমাকে সুখী কর—আমাকে কৃতার্থ কর, নচেৎ আমাকে সুখী করিতে আমার শক্তি নাই। আপনাকে সুখী করিবার জন্য যত চেষ্টা করিয়াছি, সব ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তাই তোমার পদে শরণ গ্রহণ করিলাম। হে অনাথনাথ! তুমি আমার হৃদয়দেশে মোহনবেশে একবার দাঁড়াও—আমি আমার জন্ম-জীবন সফল করি!

(৬) সূর্য্যার্ঘ্য:—পূজ্যমাত্রকেই অর্ঘ্যদান করিয়া সম্মান করিবার

বিধি আমাদের শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অনেকে "সূর্য্যার্ঘ্য" দিতে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। যাহারা স্বয়ং জড়, তাহারাই সূর্য্যপূজাকে জড়বাদ বলে। আমরা সূর্য্যকে পূজা করি বটে, কিন্তু একটা জড়পিণ্ডকে পূজা করি না। তবে আর্য্যেরা কাহাকে অর্ঘ্য দান করিতেন ? কাহার চরণে প্রণত হইতেন ?—

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্, ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে" ॥

যিনি পরব্রহ্মস্বরূপ সবিতৃদেব, যিনি দীপ্তিমান্, বিশ্বব্যাপী, সমস্ত তেজের আধার, জগতের কর্ত্তা ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, এবং যিনি পরম পবিত্র; তাঁহাকেই ঋষিরা প্রণাম করিতেন। ইহা কখনই জড়োপাসনা নহে। সূর্য্যোপাসনা যদি জড়বাদ হয়, তবে জগতের সকল সুসভ্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমতাবলম্বীরাও জড়বাদী। এই কথাটি আরও একটু বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। "আমি রাম বাবুকে চিনি"—একথা বলিলে আমার প্রকৃত পক্ষে বলা হয় যে, একটি মনুষ্য-আকৃতি-বিশিষ্ট জীবকে আমি চিনি—যাহার নাম দিয়াছি "রাম বাবু"। যদি কেহ বলে, "যে রাম বাবুকে তুমি চেন, সে রাম বাবু তাহার শরীর, অথবা তাহার শরীরস্থ চৈতন্য ?" যদি বলা যায়—"আমি শরীরস্থ চৈতন্যকে মনে করিয়াছি", তাহা হইলে আমার ভুল হইবে, কেননা যথার্থ ভাবে আমি চৈতন্যকে দেখি নাই; এবং আমার এমন একটিও বাহ্য ইন্দ্রিয় নাই, যদ্দ্বারা চৈতন্যকে চেনা যায়। যদি বলা যায়—"আমি তাহার দেহকেই মনে করিয়াছি", তাহা হইলেও আমার ভুল, কারণ শরীরের কোন্‌টা

রাম বাবু? তাহার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা অথবা ত্বক্? যদি বলা যায়,—"উহাদের সকলের সমষ্টি—তাহা হইলেও ঠিক হয় না, কারণ মৃৎপিণ্ডগঠিত দেহে অথবা মৃত শরীরে ঐ সকলের অভাব নাই, অথচ তাহাকে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না। তবে জড় দেহের সমষ্টিকে কি করিয়া "রাম বাবু" বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে "রাম বাবু" বলিতে আমি "রাম বাবুর শরীর ও চেতনাকে" বুঝিয়াছি। এইরূপে জড়ে ও অজড়ে অভিন্ন হইয়াই জগৎ ও জীব প্রকাশ পাইতেছে, কেবল মাত্র জড় বা কেবল চৈতন্য অব্যবহার্য্য, জড়ে অনিত্যতা এবং অজড়ে শূন্যতা দোষ ঘটে। সেই জন্য মানুষ, দেবতা, সবই জড় ও অজড়ের সংমিশ্রণ। যখন তাহা উভয়েরই সংমিশ্রণ, তখন কেহ জড় ভাগ, কেহ অজড় ভাগ গ্রহণ করিলেও তাহা যথার্থরূপে উভয়েরই মিলন। ইহা একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায়। যখন আমার প্রিয়তম বন্ধু আমার ঘরে আসেন, তখন আমি তাঁর দেহ ও চৈতন্য উভয়কেই আদর করি; তাঁর রূপ ছাড়িয়া শুধু তাঁর গুণে মোহিত হই না, অথবা তাঁর গুণ ছাড়িয়া রূপ লইয়া মগ্ন হই না। অল্পবুদ্ধিরা শুধু রূপ লইয়া মগ্ন হয় বটে, কিন্তু রূপকেও যে ছাড়িবার যো নাই—তাহাও যে সত্যের একদিক্। সুতরাং আমরা এই বিশ্বব্যাপী সূর্য্যের মধ্যে বিশ্বব্যাপী চেতন সূর্য্যকে পূজা করিয়া—ধ্যান করিয়া তৃপ্ত হইলেও, তাঁহার স্থূল দেহকে আমরা অমান্য করিতে পারি না। আমি জানি শরীর নশ্বর পাঞ্চভৌতিক; তবু যখন কোন পূজ্য ব্যক্তিকে প্রণাম করি,

তখন তাঁহার স্থূল শরীরের স্থূল পা দুখানিকেই মস্তকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হই—অবশ্য তাঁহার অন্তরাত্মাকে মনে মনে বিহিত সম্মান ও ভক্তি করিয়া। কারণ আমাদের জড় হস্তও যে তাঁহার জড় পদ ব্যতীত আর কিছু স্পর্শ করিতে পারে না। তদ্রূপ বিশ্বাত্মায় পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও তাঁহার এই বহিঃ সূর্য্যরূপ স্থূল আবরণকে আমরা অমান্য করিতে পারি না, এবং আমাদের পূজার চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপগুলি এবং নৈবেদ্যগুলি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হই। যাঁহারা "অসীম" বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারাও এই সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া শ্রান্ত হন; এবং যাঁহারা সসীমের মধ্যে পূজা করেন, তাঁহারাও তাঁহার অসীমতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মহারা হন। সীমাবদ্ধ শরীর ও ইন্দ্রিয় লইয়া কেহই অনন্তকে ঠিক বুঝিতে পারে না। আমরা যতই বাক্য বিন্যাস করিয়া সেই অনন্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করি, তাহাতে কবিত্ব প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু অনন্তকে পরিস্ফুট করা যায় না। বেদ বলিয়াছেন "যন্মসা ন মনুতে"। যিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি যোগে এই শরীর-মনের সীমাকে ছাড়াইয়া অনন্তে আপনার আত্মাকে মিশাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারই প্রাণে অনন্তের সুর বাজিয়া উঠে, তিনিই এই উপদেশ দিবার অধিকারী :—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"॥

এই সীমাহীন অনন্তের যত দিন উদ্দেশ না পাওয়া যায়, তত দিন এই পঞ্চেন্দ্রিয়সাধ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের মধ্যেই

তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। ইহাই সাধনক্ষেত্রের সোপান। ইহাকে কেহ কল্পনার জোরে বা গায়ের জোরে অতিক্রম করিতে পারে না। দেহের কথা না ভাবিয়া কোন লোকের গুণগুলি স্মরণ করিতে গেলেই, যেমন তাহার রূপকে মনে পড়িবে, সেইরূপ কাহারও রূপের কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার গুণাবলির কথা মনে না আসিয়া যাইবে না। অনন্ত, অব্যয়, অমর, অরূপ ভগবানের সম্বন্ধেও এইরূপ। মনুষ্য হইতে তৃণ পর্য্যন্ত, হিমালয় হইতে বালুকা-কণা পর্য্যন্ত, মহাসাগর হইতে জলবিন্দু পর্য্যন্ত, প্রত্যেকের মধ্যেই অনন্তের আভাস; কোন জিনিষটিই সসীম নয়; প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিষটি পর্য্যন্ত অনন্ত বলিয়াই তাহাদের সমষ্টিও অনন্ত। নচেৎ সীমাবদ্ধ বস্তু লইয়া অনন্ত হইতে পারে না, তাহা অসংখ্য হইলেও অন্তযুক্ত। সুতরাং আর্য্যদের অর্চ্চনাকে "জড়বাদ" বলা অত্যন্ত ভ্রান্তি ও স্পর্দ্ধার কথা! জ্ঞানযুক্ত না হইলে নিরাকারবাদী সাকারবাদী—উভয়ই জড়োপাসক। যখন "মিথ্যাকে" মিথ্যা জানিয়াও আবার তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করি, তখনি তাহা অসীম জড়বাদে আমাদের আত্মচৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; নচেৎ যে ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে, যে সত্যরূপে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, সে পাথরের পূজা করুক, বৃক্ষপূজা করুক, সেই অসীম অনন্তকেই পূজা করে। বীজকে উল্টা দিকেই বপন কর, বা সোজা দিকেই বপন কর, সে ভূমিকে বিদীর্ণ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবেই।

"মুণ্ডো বা জটিলো বা স্যাদথবা স্যাচ্ছিখাজটঃ।
নৈনং গ্রামেঽভিনিম্লোচেৎ সূর্য্যো নাভ্যুদিয়াৎ
ক্বচিৎ॥

তঞ্চেদভ্যুদিয়াৎ সূর্য্যঃ শয়ানং কামচারতঃ।
নিম্লোচেদ্বাপ্যবিজ্ঞানাজ্জপন্নুপবসেদ্দিনম্॥
সূর্য্যেণ হ্যভিনির্ম্মুক্তঃ শয়নোঽভ্যুদিতশ্চ যঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণো যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা॥
আচম্য প্রয়তো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌ দেশে জপন্ জপ্যমুপাসীত যথাবিধি॥"

ব্রহ্মচারীর উপাসন-কাল ব্যতীত হইলে প্রায়শ্চিত্ত

মনু, ২য় অঃ।

কেশরহিতমস্তক, জটাযুক্তমস্তক, অথবা জটাকার শিখামাত্র যাহার মস্তকে আছে,—যে কোন ব্রহ্মচারীই হউন না—অস্ত-সময়ে বা উদয়কালে সূর্য্য যেন তাঁহাকে গ্রামে দেখিতে না পান; অর্থাৎ সে সময়ে তিনি গ্রাম হইতে দূরে প্রান্তরে অথবা নদীতটে সন্ধ্যারাধনা করিবেন—গ্রাম্যবার্ত্তা বা অন্য কোন কর্ম্মে সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত করিয়া ফেলিবেন না। তিনি যদি স্বেচ্ছাচারিভাবে শয়ান থাকেন, আর সূর্য্য উদিত হন, অথবা অজ্ঞানবশতঃ শয়ান থাকেন, আর সূর্য্য অস্ত যান, তাহা হইলে, জ্ঞানকৃতই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক, তাঁহাকে এই পাপের জন্য সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। যিনি শয়ান থাকিতে থাকিতে সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হন, তিনি যদি উক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তবে মহাপাপগ্রস্ত হন। অতএব সূর্য্যের উদয়াস্ত উভয় সন্ধিকালে

আচমন করিয়া সুসংযত হইয়া শুচিদেশে অনন্যমনে যথাবিধি গায়ত্রী জপপূর্ব্বক উপাসনা করিবে।

ব্রহ্মচারীর বিশেষ কতকগুলি সাবধানতা।

স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। পূর্ব্বে এ বিষয়ে কিছু বলা হইয়াছে; তথাপি বিষয়টি এতই প্রয়োজনীয় যে, পুনরুক্তি করিলেও দোষের কথা হইবে না। স্ত্রীলোকসম্বন্ধে সাবধান হইবার নিমিত্ত এত জেদ এই জন্য যে, এ বিষয়ে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক, এবং একবার পদস্খলন হইলে কোথায় যে তাহার শেষ, তাহা কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এত পরিশ্রমের এত চেষ্টার ফল এক দিনের কুচিত্রদর্শনে বা অসদালাপে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। কারণ ইন্দ্রিয়দিগের স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে আকৃষ্ট হইবার অভ্যাস বহুকাল হইতে প্রবল আছে বলিয়াই আমাদের প্রচণ্ড সজাগ দৃষ্টির আবশ্যকতা এত অধিক। প্রেমের অবতার গৌরাঙ্গদেবও তাঁহার শিষ্যদিগকে সাবধান করিবার জন্য বলিয়াছেন "কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তিও মুনির মন হরণ করিতে পারে!" কথাটা হাড়ে হাড়ে সত্য। যতদিনপর্য্যন্ত মন বেশ স্থির না হয়, কিংবা "স্থিতধী"র অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিনপর্য্যন্ত এই চিত্তকে কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। এক দিনের অবিমৃশ্যকারিতা আমার এক বৎসরের পরিশ্রম নষ্ট করিতে পারে। সেইজন্যই বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন—

"আসুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্ বেদান্তচিন্তয়া।
দদ্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি॥"

গুরুগৃহে থাকিবার সময়ে শিষ্যেরা ঘরের ছেলের মতই হইয়া যায়; সেই অবস্থায় তাহাঁদের গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাগণের সঙ্গে খানিকটা মাখামাখিভাব হওয়ার সম্ভাবনা আছে; সেই জন্য মহর্ষি মনু সাবধান করিয়া দিতেছেন ঃ—

"অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেবচ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্॥
গুরুপত্নী তু যুবতির্নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্॥
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
কামন্তু গুরুপত্নীনাং যুবতীনাং যুবা ভুবি।
বিধিবদ্বন্দনং কুর্য্যাদসাবহমিতি ব্রুবন্॥
বিপ্রোষ্য পাদগ্রহণমন্বহং চাভিবাদনম্।
গুরুদারেষু কুর্ব্বীত সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥"

২য় অঃ, মনু।

গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলম্রক্ষণ, তাঁহাকে স্নাপন, তাঁহার গাত্রমর্দ্দন বা তাঁহার কেশসংস্কার করিয়া দিবে না। গুণদোষাভিজ্ঞ যুবক শিষ্য তরুণী গুরুপত্নীকে কখন পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিবে না। সংসারে দেহধর্ম্মবশতঃ সকলেই কামক্রোধের বশীভূত; সেই জন্য বিদ্বান্‌ই হউন আর অবিদ্বান্‌ই হউন, কামিনীজন অনায়াসেই তাঁহাদিগকে উন্মার্গগামী করিতে সমর্থ হয়। ইন্দ্রিয়গণ

এতদূর বলবান্ যে, তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। যদি ইচ্ছা হয়, যুবক শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীগণের পাদগ্রহণ না করিয়া, যথাবিধি 'আমি অমুক, আপনাকে অভিবাদন করি' বলিয়া ভূমিতে অভিবাদন করিতে পারেন। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে শিষ্টাচার স্মরণ করিয়া যুবক শিষ্য প্রথম দিন বৃদ্ধা গুরুপত্নীকে পাদগ্রহণদ্বারা বন্দনা করিবেন। কিন্তু তাহার পর দিন তাঁহাকে ভূমিতেই অভিবাদন করিবেন।

যে দিক্ হইতে বিন্দুমাত্রও আশঙ্কার কারণ আছে, সেখানে অধিক সাবধান হইলে ক্ষতি নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

—:০:—

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

যে সকল ব্রহ্মচারী অধ্যয়নসমাপনান্তেও গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবাহাদি সংস্কারে আবদ্ধ না হন, তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। ইঁহারা আজীবন গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া এবং গুরুগৃহে বাস করিয়া মুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এরূপ শিষ্যের সংখ্যা তখনকার কালে বিরল ছিল না। ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও আজকাল অনেক কৃতবিদ্য মহাপুরুষকে আজীবন কৌমারব্রত অবলম্বন করিয়া জ্ঞানার্জ্জনে মগ্ন হইতে দেখিয়া অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠে! কিন্তু যে ভারতবর্ষ এই নিয়মের স্রষ্টা ও বক্তা, আজ তাহারই বংশধরগণ আপনাদের পুত্রপৌত্রাদির বিবাহ সংস্কার লইয়া এতটা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন যে, অনেক সময়ে পুত্রপৌত্রাদির অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাহাদের স্কন্ধে একটী বালিকার আজীবন সুখ-দুঃখের ভার চাপাইয়া দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা অনুভব করেন না। তাঁহাদের মনে ধারণা, বিবাহ না করিলে বুঝি জীবনের সকল সুখ হইতেই বঞ্চিত হইতে হয়। কিন্তু হায়! ব্রহ্মচারীর জীবন কি সুখময়, কি পুণ্যপ্রদ, তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না! ঋষিবংশসম্ভূত বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যে ব্রহ্মচর্য্যের মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন

না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়! তাঁহারাই আবার শাস্ত্রের দোহাই পাড়েন! ব্যাপারটা কৌতুককর বটে!

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে মহর্ষি মনু বলিতেছেন —

"আ সমাপ্তেঃ শরীরস্য যস্তু শুশ্রূষতে গুরুন্।
স গচ্ছত্যঞ্জসা বিপ্রো ব্রহ্মণঃ সদ্ম শাশ্বতম্॥"

"শরীরসমাপ্তিপর্য্যন্ত যিনি গুরুশুশ্রূষা করেন, তিনি অনায়াসে শাশ্বত ব্রহ্মস্থানে গমন করিয়া থাকেন।"

"এবং চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমবিপ্লুতঃ।
স গচ্ছত্যুত্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ॥"

"এইরূপে যে বিপ্র অস্খলিতভাবে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করেন, তিনি উত্তমস্থান প্রাপ্ত হন; পুনর্ব্বার তাঁহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।"

মনু পূর্ব্বশ্লোকে যে গুরুসেবার কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র গুরুর গরুচরাণো বা আলিবাঁধা নহে, অথবা বহুশাস্ত্রাভ্যাস বা শাস্ত্রালোচনা করাও নহে—ইহাই জীবনব্যাপী ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—উপনিষদের এই মহান্ আদেশকেই এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আজীবন তপস্যার ফলে এবং গুরুর অনুগ্রহেই আমরা শাশ্বত ব্রহ্মের অনুসন্ধান পাইয়া থাকি, এবং আপনার অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের অনিন্দিত শুভ্র-শান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি হেরিয়া কৃতকৃত্য হই! শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যও এই বিদ্যাকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন;—"বিদ্যা হি কা?—ব্রহ্মগতিপ্রদা যা।" সেই বিদ্যা কি?—যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে।

গুরুর সেবা ও ভক্তি।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ"—"আচার্য্য সাক্ষাৎ ব্রহ্মের মূর্ত্তি;" কেননা তাঁহার মধ্যেই আমরা মুক্তিকে অনুভব করি। যিনি এই গুরুকে সেবা করেন, বিদ্যালাভ তাঁহারই পক্ষে সুকর ও ক্লেশনাশক হয়। শুশ্রূষাবিহীন গর্ব্বান্ধ অবিনীত পুরুষকে তত্ত্বকথা বলিবে না, ইহাই শাস্ত্রাদেশ। তাহার ভিতরকার কথা এই, যদি যথেষ্ট শ্রদ্ধা না থাকে, তবে গুরুর মধ্যে যে জ্ঞানভাণ্ডার আছে, তাহা হইতে জ্ঞানকে আকর্ষণ করিয়া আমরা আপনার কাজে লাগাইতে পারি না।

মানুষের শরীরটা তো গুরু নয়!—সে তো যন্ত্রমাত্র! তাহার ভিতরে যে "শান্ত শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তি" রহিয়াছেন, তাঁহারই ভিতর দিয়া—সেই বিশুদ্ধ নির্ম্মল কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া অখিলজগতের বন্দিত পরমেশ্বর আমাকে সাক্ষাৎভাবে কৃপা করিবার জন্য গুরুর মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং কেন্দ্রাতীত হইয়াও আমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই মনুষ্যগুরু-কেন্দ্রে চৈত্যগুরুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন। সেই "শুদ্ধবোধং চিদানন্দং" গুরু-ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করি! যিনি পতিত জীবকুলের উদ্ধারের জন্য এই জগতের মধ্যে আবির্ভূত হন, যাঁহার প্রসন্ন করুণাপূর্ণ মূর্ত্তিতে মন-প্রাণ ভরিয়া উঠে, যিনি কৃপাযুক্ত হইয়া শিষ্যকে শাশ্বত ব্রহ্মপদ দেখাইয়া দেন, যিনি সর্ব্ব বিদ্যার নিধানস্বরূপ, ভবরোগপীড়িত আর্ত্ত জিজ্ঞাসুর পক্ষে ভবরোগনাশক সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি। যে মূর্ত্তিকে স্মরণ করিয়া ভক্তিশাস্ত্র ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিয়াছেন—"আনন্দ-

মানন্দকরং প্রসন্নং, জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্। যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি॥" আমি তাঁহাকে পুনশ্চ নমস্কার করি। যাঁহার নিকট যাইবার জন্য শোভনশ্রীসম্পন্ন জগদ্‌গুরু পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ঃ—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"

বন্ধনবিমুক্ত অপগতমোহ চৈত্যগুরুর সন্নিধানে বিনীত শিষ্য আপনাকে সমর্পণ করিবেন। যে যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়াই গুরুরা বুঝিতে পারেন। শাস্ত্রের বিধান এই যে, শিষ্য প্রথম সেবাদ্বারা শুশ্রূষাদ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবেন; এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলে তাঁহাদিগের নিকট তত্ত্বকথা ও গুহ্য রহস্য সকল জিজ্ঞাসা করিবেন। সেবাদ্বারা কার্য্যের দ্বারা তাঁহারা প্রীত হইলে, তবে তাঁহারা শিষ্যের হৃদয়ের সহিত যোগযুক্ত হইতে পারিবেন ; এবং শিষ্যও তখন তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া গুরুর মধ্যে "অভয় ও অমৃত"কে দেখিতে পাইবেন। তখন গুরু যাহা বলিবেন, তাহা শিষ্যের কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে গিয়া প্রবেশ করিবে। সে সত্য উপদেশ পাইলে, আর মোহগর্ত্তে পড়িবার কখন ভয় থাকিবে না ; তাই করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

"যজ্‌ জ্ঞাত্বা ন পুনর্ম্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।"

সুতরাং, গুরুশুশ্রূষার কত আবশ্যকতা। মনু বলিয়াছেন ঃ—

"যথা খনন্‌ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥"

"যেমন খনিত্রদ্বারা খনন করিতে করিতে মনুষ্য জল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শুশ্রূষা করিতে করিতে শিষ্য গুরুগত বিদ্যা ক্রমে ক্রমে লাভ করিয়া থাকেন।"

মনু আরও বলিয়াছেন :—

"তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে।
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ॥
ত এব হি ত্রয়োলোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমাঃ।
ত এব হি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥
পিতা বৈ গার্হপত্যোঽগ্নির্ম্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী॥
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥"

"প্রতিদিন পিতামাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে—আচার্য্যেরও সর্ব্বদা প্রীতি উৎপাদন করিবে। ইঁহারা তিনজনে তুষ্ট থাকিলে সমুদয় তপস্যা সম্পন্ন হয়, ইঁহাদের তিনজনের শুশ্রূষাকেই পণ্ডিতেরা পরম তপস্যা বলিয়াছেন। ইঁহাদের অনুমোদিত না হইলে, অপর কোনও ধর্ম্মের আচরণ করিতে নাই। ইঁহারা তিন জনেই ত্রিলোক প্রাপ্তির হেতু, ইঁহারা তিনজনেই আশ্রমত্রয়লাভের কারণ, ইঁহারা তিনজনই ত্রয়ী-বেদ, এবং ইঁহারা তিনজনই তিন অগ্নি; পিতা গার্হপত্য অগ্নি, মাতা দক্ষিণ অগ্নি এবং আচার্য্যই আহবনীয় অগ্নি;

এই তিন অগ্নিই পৃথিবীর মধ্যে গরীয়ান্। এই তিন জনের উপর প্রমাদ প্রকাশ না করিয়া যে গৃহী ইঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা অবহিত থাকেন, তিনি তদ্দ্বারা ত্রিলোক জয় করেন; তিনি স্বশরীরে দীপ্যমান হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে বিমলানন্দ উপভোগ করেন।”

গুরুদক্ষিণা।

বিদ্যাধ্যয়ন শেষ করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবার বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাই। পূর্ব্বকালে অধীতবিদ্য শিষ্যদিগকে যে গুরুদক্ষিণা দিতে হইত, তাহার ভার ক্ষত্রিয় রাজগণ গ্রহণ করিতেন। শিষ্যেরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন; তাঁহারা যে অপার্থিব সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের চিত্ত এত বিভোর ছিল যে, অর্থভোগ-উপকরণের বিষয় লইয়া তাঁহারা বড় একটা ভাবিবার আর অবসর পাইতেন না। তবে শিষ্যের প্রতি কৃপা করিয়া বিদ্যার সফলতার জন্য তাহার নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিতেন মাত্র। শিষ্যের সেবা ও শুশ্রূষাকেই তাঁহারা দক্ষিণা বলিয়া জানিতেন। এ সম্বন্ধে যে লোকাচার প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা মনু হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

“স্নাস্যংস্তু গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুর্ব্বর্থমাহরেৎ ॥
ক্ষেত্রং হিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমাসনম্।
ধান্যং শাকঞ্চ বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ ॥”

“যখন শিষ্য গুরুর আজ্ঞামত ব্রতসমাপন-স্নান করিবেন, তখন শিষ্য যথাশক্তি গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিবেন। তখন ক্ষেত্র, সুবর্ণাদি, গো, অশ্ব, ছত্র, চর্ম্মপাদুকা, আসন, ধান্য, শাক,

বস্ত্র, যাহা কিছু হউক, গুরুকে দিয়া গুরুর প্রীতি উৎপাদন করিবেন”।

ব্রহ্মচর্য্যব্রত-উদ্যাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীকে সমাবর্ত্তন-স্নান করিতে হইত। তারপর তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতেন। এই সময়ে ব্রহ্মচারীর বয়স ২৪।২৫ হইতে ৩৫।৩৬ বৎসর। কিন্তু এখন আমরা উপনীত বালককে তিনদিন মাত্র দণ্ডগৃহে রাখিয়া, প্রায় চতুর্থ দিনেই সমাবর্ত্তন করাইয়া লই; পাছে, ছেলে অধিক দিন ব্রহ্মচর্য্য করিলে লেখা পড়ার ক্ষতি হয়, বা অধিকদিন সন্ধ্যাবন্দনা করিলে গৃহধর্ম্মে উদাসীন হয়! তারপর, পাঠাবস্থায় বিবাহ দেওয়া; ইহা তো আমাদের দেশে সংক্রামক রোগ বলিলেই মনে হয়! আমাদের দুর্গতির তো সীমা নাই! হায়! তবু কি আমাদের চেতনা হইবে! শাস্ত্রবিধির প্রতি অসাধারণ উদাসীনতাই আমাদের দেশের ও দেশবাসীর দুর্গতির কারণ। ভগবান্ এই অধর্ম্মের দুরত্যয় গ্লানি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন!

সমাবর্ত্তন-স্নান।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বর্ত্তমান দেশকালপাত্রানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা, শিক্ষার সদুপায় ও শিক্ষার উদ্দেশ্য।

"লক্ষ্য"টি এক থাকিলেই হইল; কিন্তু লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে যে সকল বর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়, তাহার সময়ানুযায়ী পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়। পূজ্যপাদ ঋষিগণও এই নিয়ম অবলম্বন করিতেন বলিয়া আমার ধারণা। বিভিন্ন পুরাণে আচারব্যবহার-প্রণালীর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এক একটি পুরাণকে যদি এক একটি যুগের বা কল্পের ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র মনে করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সময়ানুযায়ী প্রয়োজনবোধে ঋষিরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতেন—বিরুদ্ধ পথ নহে; এবং এই জন্যই লক্ষ্য হইতে কখনই দূরে গিয়া পড়িতেন না। বাস্তবিক এ কথা যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে 'কালের' যে একটা প্রভাব আছে; তাহা স্বীকার করা চলে না। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থায়, মনঃ ও শরীরের সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন কার্য্যের বিধান আছে, তাহা আমরা প্রত্যহই মানিয়া চলিতেছি; নচেৎ জীবনধারণ কিছুতেই সুখকর হয় না, ইহা অত্যন্ত নিশ্চিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে যে, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার যুগ, বিজ্ঞানের কাল, ইংরাজের রাজত্ব; সুতরাং আমাদের সকলেরই ইংরাজি ভাষার ও বিজ্ঞানচর্চ্চার আবশ্যক। আমি যদি

তাহাতে আস্থা না করি, তাহা হইলে এযুগে সভ্যসমাজে আমার স্থান পাওয়া দুরূহ। জীবনসংগ্রামেও আমার স্থায়িত্বের আশা অল্প। যদি কেহ বৃদ্ধকালে বালক হইতে চায়, বা যৌবনে বার্দ্ধক্যকে সুখকর মনে করে, তবে সেই মূঢ় বৃদ্ধের ও অকালপক্ক যুবকের ইন্দ্রিয়নিচয়ের স্বাভাবিক পরিপুষ্টতাসম্বন্ধে আমাদের স্বতঃই সন্দেহ আসিয়া পড়ে। কালের সহিত কার্য্যের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা আমাদের কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না।

এতগুলি কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আগে শিক্ষা-দীক্ষার যে বিধি-ব্যবস্থা ছিল, তাহা এ যুগেও চলিতে পারে কি না, এবং সেই প্রণালী বর্ত্তমান যুগে অবলম্বন করিলে, আমরা সফলতালাভে সমর্থ হইব, কি না।

কিন্তু এইখানে একটি কথা আমি বলিয়া রাখি। 'জীবনের সফলতা' বলিতে আমরা মনে মনে যাহা বুঝিয়া রাখিয়াছি, তাহা বাস্তবিকই জীবনের সফলতা নহে। ধন-ধান্যে এবং উপকরণে আমাদের গৃহস্থলী পরিপূর্ণ হইলেও, আমরা সে সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না—অথচ সে সার্থকতা লাভ না হইলেও সমস্ত জীবনই বিফল হইবে! জীবনের সার্থকতা ঠিক বাহিরের দিক্ দিয়া বুঝিতে গিয়াই আমরা ভারতবর্ষীয় জীবনকে আঘাত করিয়াছি, এবং স্বার্থকে বরণ করিয়া লইয়াছি! এটি এখন আমাদের মধ্যে বিষের মত কার্য্য করিতেছে! বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি গাহিয়াছেন "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, ডুবে মরি পলে পলে!" এই স্বার্থের মুখ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে এবং এই স্বার্থ থাকিতে যতপ্রকার

দুষ্কর্ম্ম, যতপ্রকার অধর্ম্ম আছে কিছুই করিতে আমাদের বাধা নাই! কারণ, আমার স্বার্থকে যে কেহ বাধা দিতে আসিবে, আমি তাহার গাত্রে বিষদন্ত ফুটাইয়া দিতে ছাড়িব না! তবে এই হানাহানি, এই মারামারি, এই স্বার্থের ভীষণ সংঘাতই কেবল সংসার! এবং ইহার লাভকেই আমরা মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা বলিয়া ভাবিতেছি! একথা মনে করিতে গেলেও শরীরে মনে অসহ্য জ্বালা অনুভূত হয়! কিন্তু সমস্ত স্বার্থের কলহ, অনন্ত শোকদুঃখের সন্তাপ কি সুন্দরভাবেই জুড়াইয়া যায়, আমরা কি মুক্তিই লাভ করি,—যদি আমরা বুঝি, আমাদের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ কিছুই নয়, আমাদের এই জীবনের মহাযাত্রার শেষ উদ্দেশ্য—আনন্দময়ের সহিত আনন্দের মিলন—আমাদের চরম মুক্তি সেই ভূমার মধ্যে! আমার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অহংশক্তিকে সেই বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত বৃহতের মধ্যে প্রবেশ করাইতেই হইবে! আমার 'অহং'এর সার্থকতা জগতের যাবতীয় ব্রীহি, স্ত্রী ও পশু পাইয়া নহে, আমার চরম সার্থকতা সেই ভূমার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া!

এ মুক্তি যতদিন আমরা না পাই, ততদিন জগতের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কথাকে, ক্ষুদ্র ব্যাপারকে বড় বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে, এবং অতিসামান্য কারণেই আমাদের অসংযত চিত্তের ভারকেন্দ্রকে কেন্দ্রচ্যুত করিয়া ফেলা বরং ক্রমশঃ সহজ হওয়াই সম্ভব; এবং হইতেছেও তাই! তবে আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি?

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন গচ্ছেৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে।"

আমাদের পূর্ব্বপিতামহ ঋষিদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিলেই আমাদের জীবন সার্থক হইতে পারিবে। আজকাল অনেকেই ভাবেন, যে পথে তাঁহারা গিয়াছেন, সে পথ ধরিয়া চলিলে, তাঁহাদের জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত জাতি যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমাদিগকেও ঠিক সেই পথ অনুসরণ করিতে হইবে; আর যদি তাহা না করি, তবে এই জীবন-সংগ্রামে আমরা বিনষ্ট হইব।

আমরা যে বিনষ্ট হইতে পারি না, সে কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু সেই দিনই আমাদের বিনাশ স্থির নিশ্চিত, যেদিন আমরা মূঢ়ের ন্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা অনুমোদন করিব!—যখন স্বার্থসাধনই আমাদের কাছে বড় বলিয়া ঠেকিবে এবং দেহধারণের ব্যাপারকেই জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিবে!

পূজ্যপাদ ঋষিগণ এই সংসারে আসিয়া কাহাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন?

"যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥"

"যিনি সূর্য্যাদি তেজেরও প্রকাশক, যিনি অণু হইতে অণু অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম, যাঁহাতে ভূরাদি লোক এবং তত্তৎস্থানবাসী জনসমূহ অবস্থান করিতেছে—তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ ও বাঙ্মনঃস্বরূপ; তিনিই সত্য এবং অমৃতস্বরূপ; হে

সোম্য, মনরূপ শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ কর, অর্থাৎ তোমার চিত্ত তাহাতে সমাহিত কর।"

পুনশ্চ, তাঁহারা শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছেন :—

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥"

একমাত্র তাঁহাকেই জান, তাঁহার কথাই আলোচনা কর—অন্য কথা ছাড়িয়া দাও; কারণ, এই মর-জগৎ অতিক্রম করিয়া অমৃতলাভ করিতে হইলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সেতু।

ভারতবর্ষ এই সত্য ও অমৃতকে ছাড়িয়া, কোন্ মিথ্যা মায়ার পশ্চাতে ছুটিয়া ছুটিয়া, দেহ-মনকে ক্লান্ত করিয়া তুলিবে? মহা বিনাশ হইতে যদি পরিত্রাণ পাইতে চাই, তবে আমাদিগকে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে হইবে যে, আমরা ভোগোপকরণ লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিব না! আমরা সেই অমৃতকে, সেই পূর্ণানন্দস্বরূপকে চাই! যিনি সমস্ত অন্ধকারের পরপারে তাঁহাকেই আমরা চাই! তাঁহারই আমাদের প্রয়োজন!

যাঁহারা ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধা বহন করেন, এবং তাঁহাদের আদেশ অবনতশিরে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রাচীন কালের শিক্ষাপ্রণালীর (Training) মধ্যে এমনতর একটি সুন্দর বিধি ব্যবস্থা ছিল,—(যাহা মোহবশতঃ এখন আমরা ভুলিতে বসিয়াছি!)—যাহা আমাদের মত্তমাতঙ্গের ন্যায় চিত্তকে উচ্ছৃঙ্খলতার গভীর গহ্বর হইতে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ন্যায় প্রচণ্ড বেগে ব্রহ্মের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া রাখিত। স্বেচ্ছা

চারিতা ও অপবিত্রতা সেই পবিত্র মণ্ডপের পাদদেশেও পদক্ষেপ করিতে সভয়ে সঙ্কুচিত হইত!

প্রাচীনকালে ও বর্ত্তমানযুগে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ।

পূর্ব্বকালে বিদ্যাদান ও বিদ্যাগ্রহণের মধ্যে একটি পবিত্র সম্বন্ধ ছিল। একদিকের উদারতা ও অপরদিকের শ্রদ্ধা এই পবিত্র বন্ধনটিকে সুদৃঢ় করিয়া রাখিত। এখনকার অধ্যাপক-ছাত্রের মধ্যে প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের সে নিগূঢ় সম্বন্ধটি আর নাই। সে কালে গুরুরা শিষ্যকে শুধু বিদ্যাই দান করিতেন না; বিদ্যার সহিত স্নেহ-ভালবাসাকে মাখাইয়া একটি অভিনব কল্যাণের পন্থাকে উন্মুক্ত করিয়া দিতেন; এবং ইহাতেই প্রাচীন কালের শিষ্যেরা একটি যথার্থ কল্যাণলাভে সমর্থ হইত। বর্ত্তমান কালের অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগকে সে স্নেহের সহিত সেরূপ শিক্ষা দিতে পারেন না; সুতরাং হাজার হাজার Moral Philosophy পড়িয়াও ছাত্রেরা কোন কল্যাণই লাভ করিতে পারে না। তাঁহাদের কোন শিক্ষাই বালকেরা মর্ম্মের ভিতর গ্রহণ করিতে পারে না। ঋষিরা তাই বলিয়াছেন—"শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্"—যদি পার শ্রদ্ধার সহিত দিও, অশ্রদ্ধার সহিত দিয়া কোন লাভ নাই; কারণ তাহা না দেওয়ারই সমান। এখনকার অধ্যাপকেরা ছাত্রদিগের প্রতি শিষ্যের ন্যায় ব্যবহার করেন না। বেতন পান, তাই পড়ান; ছাত্রদিগের শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ হইল, না হইল, তাহাতে তাঁহাদের কিছুই যায় আসে না। এই যে "কিছুই যায় আসে না," এই খানেই শিক্ষাদান নিস্তেজ ও নিষ্ফল!

অধ্যাপকের যদি বিদ্যাদানের প্রতি ও বিদ্যার্থীর প্রতি শ্রদ্ধা ও স্নেহ না থাকে, তবে ছাত্রেরও সে বিদ্যা লাভ করিয়া কোন সুফল হয় না; কারণ পরস্পরের অশ্রদ্ধার প্রাচীর উভয়ের হৃদয়ের মধ্যস্থলে পাহাড়ের মত একটি ব্যবধানকে নিত্য খাড়া করিয়া রাখে।

পূর্ব্বকালের শিষ্যদিগের গুরু-ভক্তি ও গুরুদিগের শিষ্য-গণের প্রতি স্নেহানুরাগ।

"আচার্য্যদেবো ভব"—ইহাই প্রাচীনেরা বলিতেন। শিষ্যেরা আচার্য্যকে প্রকৃতই দেবসদৃশ দেখিতেন, পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন; গুরুরাও শিষ্যদিগকে বুকের ভিতর করিয়া পুত্রোচিত স্নেহে প্রতিপালন করিতেন ও বিদ্যাভ্যাস করাইতেন। পরস্পরের এই ভক্তি ও স্নেহের আদান-প্রদানে বিদ্যালাভ শিষ্যের পক্ষে যে কতটা সহজ ও সুখকর হইত, তাহা বর্ত্তমান যুগে ধারণা করাই কঠিন। ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রথম আরম্ভে ও তাহার পূর্ব্বে অধ্যাপক ও শিষ্যদের মধ্যে এই সম্বন্ধ কতকটা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু যতই আমরা সভ্য হইতেছি এবং বিজ্ঞানের আলোক পাইতেছি, ততই আমরা প্রাচীন পন্থা হইতে আপনার চিত্তকে বিমুখ করিয়া রাখাই সভ্যতার সোপান বলিয়া বুঝিতেছি!

ঋষি আশ্রম স্বভাবের সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

সেকালে এই আশ্রমগুলির স্থাননির্ব্বাচনেরও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। স্বভাবের শোভা ও সৌন্দর্য্য যেখানে স্বতঃই পরিস্ফুট, এইরূপ বিশিষ্ট স্থানগুলিতেই ঋষিদিগের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। বালকেরা প্রকৃতির সেই অবাধ অনাবৃত সৌন্দর্য্যের মধ্যে শিক্ষালাভ করিয়া শরীরে ও মনঃ-প্রাণে খুব বাড়িয়া উঠিত।

আশ্রমের চারিদিকেই প্রকৃতির উন্মুক্ত শোভা; সেখানে কৃত্রিমতার লেশমাত্রও নাই। ঊর্দ্ধে উদার-অনন্ত গ্রহতারকালঙ্কৃত সুনীল নভোমণ্ডল, অদূরে কলনাদিনী স্বচ্ছস্রোতস্বিনীর জলকলতান, চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ বনস্পতির ঘনপল্লবাচ্ছাদিত নিবিড় ছায়া ও অসংখ্য শাখা-প্রশাখার অপূর্ব্ব বিস্তার, সুদূরে নীলবসনাচ্ছাদিত নয়নলোভন গিরিশ্রেণীর অপরূপ সৌন্দর্য্য, স্থানে স্থানে ফলপুষ্পভারাবনত পাদপশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ! কোথাও বা লতাবিতানমণ্ডিত নিকুঞ্জকানন, পয়স্বিনী গাভী ও গোবৎসসমূহের স্নেহপূর্ণ শান্তদৃষ্টি, বিহগকুলের নিশ্চিন্ত প্রাণের মধুর কাকলী, হরিণশিশুগণের নিতান্ত নির্ভয়ভাব ও ঋষিকন্যাগণের আলবালে জলসেচন এবং তাঁহাদিগের বিরল বস্ত্রালঙ্কারের মধ্যেও মুখশ্রীর অপূর্ব্ব সরলতা ও সৌকুমার্য্য, এইগুলি একত্র প্রাণের ভিতর এমন একটি উদার রাগিণীর সৃষ্টি করে যে, সংসারের কৃত্রিম সৌন্দর্য্য ও সাজসজ্জায় পূর্ণ, ভোগবিলাসে প্রমত্ত, অনুদার রাজন্যবর্গকেও এই তপোবন-শোভা মোহমুগ্ধ করিয়া রাখে, এবং তাহাদের সুখাসক্ত চিত্তও ক্ষণেকের জন্য বৈরাগ্যের ছায়ায় পূর্ণ হইয়া যায়।

স্বভাবের এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও গুরুগণের অসাধারণ প্রীতিস্নেহের মধ্যেই বালকেরা বহুগুণে ভূষিত হইয়া স্নেহে, প্রেমে, ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া সদ্যোবিকশিত কুসুমের ন্যায় কমনীয় শোভায় শোভিত হইয়া উঠিত এবং জ্ঞানে, বীর্য্যে, বৈরাগ্যে ও ধৈর্য্যে অটল গিরিশ্রেণীর ন্যায় সুদৃঢ় অথচ সুন্দর হইয়া উঠিত। **প্রতিভার বিকাশ** এইরূপ স্থানেই সম্ভব হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান কালের শিক্ষাগার বালকদিগের চরিত্র গঠনের অন্তরায়।

বর্ত্তমান কালে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে সকল স্কুল-কালেজ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার সকলগুলিই প্রায় সহরের গোলমাল ও হৈ-চৈ এর মধ্যে অবস্থিত।* জনকোলাহলপূর্ণ সহরগুলি বিদ্যাশিক্ষার ও ছাত্রবাসের প্রকৃষ্ট স্থান নহে। সহরে অনেক প্রলোভন; তরলমতি বালক ও যুবকদিগকে ঐ সকল সহরের মধ্যে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাহা অনুসন্ধানশীল, বালকদিগের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। ঐ সকল সহরে শতকরা ৯০ জন বালককেও নিষ্কলঙ্কভাবে ফিরিয়া আসিতে প্রায়ই দেখা যায় না। সেখানে তাহারা উপযুক্ত অভিভাবকের অভাবে যথেচ্ছাচার অবলম্বন করে। রঙ্গালয়ে গিয়া কুৎসিত অভিনয় সকল দর্শন করে, এবং কালসর্পের ন্যায় সহস্র কুচিন্তা বক্ষে পুষিয়া

---

* আজকাল স্থানে স্থানে আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রযত্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি আশ্রমানুরূপ শিক্ষাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আশ্রম তাঁহার জগৎপূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেবের সুদীর্ঘ তপস্যাসঞ্চিত শক্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত বোলপুর-শান্তিনিকেতনের অবারিত প্রান্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আর্য্যসমাজীদিগের গুরুকুলের আশ্রমও অনেকটা প্রাচীন কালের অনুকরণে পরিচালিত। শ্রীমৎসচ্চিদানন্দব্রহ্মচারী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রামে রজনার অন্তর্গত আশ্রমটিও যথার্থ হিন্দু-আদর্শে সংগঠিত। ইহা সমস্তই শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

রাখে। এ সকলের যে কি শোকাবহ পরিণাম, তাহা অনেকেই হয়তো বেশ চিন্তা করিয়া দেখেন না।

এইরূপে সময়ের ও অর্থের অপব্যবহার করিয়া তাহারা স্বজন ও স্বদেশকে যে কি ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার লোক আমাদের দেশে কয়জন আছে, তাহা আমি ঠিক জানি না। আহারে, বিহারে, শয়নে, ভোজনে, বাক্যে, ব্যবহারে তাহাদের সংযমের সম্পূর্ণ অভাব। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নাই, স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ নাই, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, এ সকল কি শিক্ষা? ইহাতে কিরূপে আমাদের উন্নতি হইবে? মানবজীবনের চরম লক্ষ্যকেই বা বালকেরা কিরূপে বুঝিতে পারিবে? অভিভাবকদেরও অনেকটা ইহাতে ত্রুটি আছে; তাঁহারা গোড়াতে যে শিক্ষার পত্তন করিয়াছেন, সেই শিক্ষার গোড়াতেই বিষম গলদ্!

জীবনের লক্ষ্য কি?—কেবলই কি অর্থোপার্জ্জন! ছাত্রদের কার্য্য কি?—কেবলই কি কতকগুলি প্রাণহীন নীরস পুস্তক-স্থিত বিষয়সমূহের গলাধঃকরণ! স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কি কেবলই বক্তৃতা ও হৈ হৈ করিয়া বেড়ানো! এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি কেবলই সংবাদপত্রে হা হুতাশ করিয়া শক্তি নিঃশেষিত করা!

পাশ্চাত্য জগতে ছাত্রদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন সুশিক্ষা দিবার বেশ সুযোগ ও সুব্যবস্থা আছে—(অবশ্য তাহাদের আদর্শমত); তাই তাহারা বিদ্যায়, জ্ঞানে, ও সামর্থ্যে এত বড় হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে বালকদিগের ভাগ্যরচনার কোন লোক নাই,

—কোন বিধান নাই! তাহারা স্রোতস্তাড়িত তৃণের ন্যায় প্রবৃত্তির স্রোতে বিনাশের গম্ভীর গহ্বরে নিমগ্ন হয়! ইহার জন্য আমি রাজাকে দোষ দিই না; আমাদের সমস্ত ভারই কি রাজার উপর দিয়া আমরা আলস্যে দিন কাটাইব? আমাদের কি কিছু কর্ত্তব্য নাই? এ বিষয়ে স্বাধীনভাবে যদি কেহ চেষ্টা করেন, তবে আমার মনে হয়, তিনি পরোক্ষে রাজাকেই সাহায্য করেন; কারণ ধর্ম্মতঃ যুবকদিগের শিক্ষার ভার রাজার উপরই ন্যস্ত, এবং তিনি সে বিষয়ে যথাসম্ভব মনোযোগ দিতেছেন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর সুব্যবস্থা বিদেশীয় রাজার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ রাজা হিন্দুদের ঠিক মর্ম্মস্থান অনুভব করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। ইহাতে তাঁহার দোষ নাই, কারণ রাজার সহিত আমাদের ভাষা, ধর্ম্ম ও ভাবের পার্থক্য এত অধিক যে, আমাদের মত করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

সত্যই কি ইহার কোন প্রতিবিধান নাই? সত্যই কি আমাদের দেশের যুবকদিগের উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই? যদি আমরা গোড়ায় সাবধান হইতে পারি, তাহা হইলে ধ্বংসের মুখ হইতে তাহাদিগকে যে রক্ষা করা চলে না, তাহা নহে। কিন্তু সাধারণতঃ অভিভাবকেরা গোড়ায় বালকদিগের চরিত্ররচনা বা শিক্ষাদানের কোন সদুপায় অবলম্বন করেন না। কারণ, অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগের জীবনকে উৎসর্গ করিতে হইয়াছে। সারাদিন মনিবের ও সংসারের দাসত্ব করিয়া সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ

অপব্যয়িত হইয়া যায়। জীবনে যে আর কিছু দেখিবার, শুনিবার, বুঝিবার ও করিবার আছে, তাহা তাঁহাদের ভাবিবারও অবসর থাকে না। দাসত্ব ভিন্ন উপায় নাই, কারণ আমরা খাইতে পাই না। দৈববিড়ম্বিত দেশ দিন দিন নিরন্ন হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় তেমন কিছু করা চলে না জানি, কিন্তু তাই বলিয়া হতবুদ্ধির মত নিশ্চেষ্ট থাকাই কি কল্যাণলাভের একমাত্র উপায়? ইহারই মধ্যে আমরা যতটা পারি, আমাদের নিজের চেষ্টায় নিজের হাতে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিঃস্ব দেশ দরিদ্র ভারতবাসী বালকদিগের শিক্ষার বিপুল ব্যয়ভারবহনে অক্ষম। এই ব্যয়কে কি কোন উপায়ে সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না? চিকিৎসার ব্যয়ভার, গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়ভার, বিবাহের ব্যয়ভার যেরূপ দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার উপর শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে জীবনান্ত কষ্টকর হইয়াছে। সুতরাং দেশের এই দুর্দ্দিনে পিতা বা অভিভাবকের যখন সময়ের ও অর্থের অভাব, তখন এদেশে কি একদল লোক নিঃস্বার্থভাবে এদেশের ছেলেদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন না? মনুষ্যজীবন একটি গৌরবের জিনিস; কিন্তু প্রতিদিন মনুষ্যত্বকে অপমানিত করিয়া আমরা এইরূপে ভগবানের স্নেহের দান হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াই কি সফলতার চরম সীমায় উপনীত হইব?

সুতরাং, আবার একবার আমাদিগকে ঋষিবাক্য স্মরণ করিতে হইবে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত!" তাই আমার মনে হয়, আমাদের এমন একটি সম্প্রদায় থাকা প্রয়োজন, যাহারা

বিবাহাদি না করিয়া পরমকল্যাণকর এই লোকহিতব্রতে আপনাদের মনঃ, প্রাণ, অর্থ, সমস্তই উৎসর্গ করিবেন।

এই সকল ত্যাগশীল ব্যক্তিরা করিবেন কি? তাঁহারা কোন পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর নিকটে নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে সংসারের সর্ব্বপ্রকার কোলাহল হইতে দূরে পূর্ব্বকালের ঋষিদিগের আশ্রমের ন্যায় 'শিক্ষাগারসমূহ স্থাপন করিবেন। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্র থাকিবে এবং আশ্রমে যথেষ্ট গাভী, বলীবর্দ্দ ও মহিষাদি থাকিবে। গুরু ও শিষ্যেরাই এই পশুসকলকে সযত্নে প্রতিপালন করিবেন, এবং ভূমির কর্ষণের দ্বারা সুশস্য-উৎপাদনে তাঁহাদের যথেষ্ট যত্ন থাকিবে। এইরূপে আশ্রমের ব্যয় আশ্রম হইতেই নির্ব্বাহ হইবে। আশ্রমগৃহের চতুষ্পার্শ্বে ফল-ফুলের বৃক্ষ সকল যথেষ্ট মাত্রায় রোপিত হইবে, এবং স্থানটি যাহাতে আশ্রম-শোভায় শোভিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই আশ্রমে অতিথিরা সৎকৃত হইবেন, এবং তাঁহাদের ২।৪ দিনের অবস্থানের জন্য ব্যবস্থাও থাকিবে। এই অতিথিদিগের সেবার ভার গুরুরা উপযুক্ত শিষ্যের উপর বিধান করিবেন। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী কোন রোগাতুর দরিদ্র আশ্রয়হীন অবস্থায় থাকিলে, গুরুজন শিষ্যদিগের দ্বারায় তাহাদিগের শুশ্রূষা করাইবেন। আশ্রমস্থ গাভী সকল ও পশু সকলের তত্ত্বাবধানের ভার শিষ্যদিগেরই উপর অর্পিত থাকিবে।

বালকেরা যথারীতি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে স্নানাদি ও সন্ধ্যোপসনার অবসানে, অগ্নিগৃহে হোমার্চ্চনার পরিসমাপনান্তে, আচার্য্যের পাদাভিবন্দনপূর্ব্বক পাঠা-

ভ্যাসে রত হইবে। সময়ে সময়ে ইন্ধনের যোগাড় করিয়া, ফলমূলের সংগ্রহাদি করিয়া, জল আনয়ন করিয়া আশ্রমের পাকের কার্য্যেও তাহারা সাহায্য করিবে। ইহাতে তাহাদিগের আর পৃথক্ ব্যায়ামাদির প্রয়োজন হইবে না। মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ গ্রামে গুরু-দিগের সহিত শিষ্যেরা ভ্রমণার্থ বহির্গত হইবে এবং পল্লিবাসী দুঃস্থ পরিবারবর্গ ও শ্রমজীবীদিগের খবরাখবর লইয়া আসিবে।

বিদ্যালয়ে প্রবেশের কাল ও তাহাদিগের কর্ম্মের বিধান।

৭।৮।৯ বৎসরের বালকদিগের এই বিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার থাকিবে। তাহারা বৎসরান্তে অতি অল্প কয়েক দিনের জন্য স্বগৃহে যাইবার অনুমতি পাইবে। আপনাদের শরীর, বস্ত্র, গৃহ, পুস্তক বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার অভ্যাস করিবে; কিন্তু বেশবিন্যাসের প্রতি উদাসীন থাকিবে। আশ্রমে যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাদিগের শরীর ও মনকে গঠিত করিবার জন্য কঠোরভাবে তাহারা ব্রতকে পালন করিবে। যথা, পাদুকা ব্যবহার করিবে না, ছত্রাদি ব্যবহার করিবে না, মৎস্য-মাংসাদি ব্যবহার করিবে না, দুই-তিন ক্রোশ কোথাও যাইবার প্রয়োজন হইলে, কোন শকটের সাহায্য গ্রহণ করিবে না। বস্ত্রাদি নিজেরাই গুছাইয়া রাখিবে। এখানে কোন ভৃত্য থাকিবে না,—যে তাহাদের হইয়া কোন কর্ম্ম করিয়া দিবে। আপনার জন্য কাজ করাকে অগৌরব বলিয়া মনে করিবে না।

এখন কথা এই, এখানকার ছাত্রেরা কি শিক্ষালাভ করিবে? আমরা এখানে সংস্কৃত, বাংলা এবং কিছু কিছু ইতিহাস, ভূগোল,

অঙ্ক, ও ইংরাজী শিক্ষা দিব। যাহাতে সংস্কৃতের সমধিক চর্চ্চা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষাটা অর্থকরী না হইয়া শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য যাহাতে তাহাদের উপলব্ধি হয়, তাহার চেষ্টা গোড়া হইতেই করিতে হইবে। তারপর প্রশ্ন হইবে—এখান হইতে শিক্ষা শেষ করিয়া তাহারা কি করিবে?

ফলকথা যাঁহারা এই আশ্রমেই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে চায়, তাহারা যাহাতে এখানে কিছু অধিক দিন থাকিয়া সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, বেদ প্রভৃতি একটি বা একাধিক বিষয়ে সমধিক জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। কেহ যদি প্রয়োজন বুঝেন, এখান হইতে private পরীক্ষা দিয়া, পরে কোন কলেজে পড়িতে পারিবেন। যাহাদের এ আশ্রমে অধিক দিন থাকা দৈবকারণবশতঃ অসম্ভব হইবে, তাহাদিগের মধ্যেও এইটুকু ফল নিশ্চয় হইবে যে, তাহারা বলবান্ ও কার্য্যক্ষম হইবে; তাহারা ঐহিক মান, মর্য্যাদা, অর্থ, প্রতিপত্তিকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে শিখিবে, নাস্তিক হইবে না, ঈশ্বরে শ্রদ্ধাভক্তি-যুক্ত হইবে। প্রয়োজন হইলে, তাহারা ইতর ব্যক্তিদিগেরও সেবা করিবে; ছোটলোক বলিয়া ঘৃণা করিবে না। এমন কি সাধনসম্পন্ন হইয়া যথার্থ আদর্শ গৃহীও হইতে পারে।

এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ক্রমশঃ বিস্তার।

দশ বৎসরে এক শত জন ছাত্রকে এইরূপে শিক্ষাদান করিয়া যদি তন্মধ্যে দশটিকে মানুষ করিয়া তোলা যায়, তাহাও, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে তাকাইলে, অলাভ বলিয়া

মনে হইবে না। অনেকে মনে করিতে পারেন, কোটি কোটি লোকের মধ্যে ৫০টি লোকের ভাল হওয়ায় দেশের কি সুবিধা হইবে? আমি তদুত্তরে বলিব, আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে; স্থির, ধীর, বিনম্র চিত্তে অপেক্ষা করিতে হইবে। বীজ বপন করিবামাত্র যদি কেহ ফলফুলশোভিত বৃক্ষের জন্য আকুল হইয়া উঠেন, তবে এ চেষ্টায় তাঁহার যোগ না থাকাই ভাল। এ ব্রতে ধৈর্য্যের সহিত দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে যে পরিমাণে আমাদের অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা হইতে কিছু পরিমাণে উদ্ধারের আশা থাকিতে পারে। ধৈর্য্যশীল বীজাধিকারী বীজকে বপন করিয়া প্রতিদিন স্নেহের সহিত তাহাতে জল সেচন করিতে থাকে; এইরূপ বহুকালের চেষ্টায় ও ধৈর্য্যে তাহার সুচিরাকাঙ্ক্ষিত আশাবীজ ক্রমশঃ বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, এবং সেই বৃক্ষ কালক্রমে ফলদানে সমর্থ হয়।

এই সকল ছাত্রেরা মানুষ হইয়া আবার স্থানান্তরে আশ্রম স্থাপন করিবে, এবং শিক্ষাদানের ব্রতগ্রহণ করিবে। এইরূপে আমাদের আদর্শশিক্ষাগার ক্রমশঃই দেশে বহুল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আশ্রমস্থ বালক দিগের ভবিষ্যৎ কি হইবে?

এই সকল বালকদিগের ভবিষ্যৎ অশন-বসনের ভার কে লইবে, এ ভাবনা আসে বটে; কিন্তু তাহা নিরর্থক। "পাত্রমায়াতি সম্পদম্"—উপযুক্ত হইলে, সুপাত্র হইলে, অর্থাভাব হইবে না। স্বচ্ছল জীবনযাত্রা ও পরিবার পালন যদি উদ্দেশ্য হয়, এবং বড়মানুষী করা যদি মনুষ্যত্বের লক্ষণ না হয়, তাহা হইলে, এই সকল

শিক্ষিত ভদ্র ও সাধু চরিত্র যুবকদিগের অন্নসংস্থানের অভাব হইবে না; আমরা আজকাল আমাদের অভাবকে যেমন অকারণ ফাঁপাইয়া গুরু করিয়া তুলিয়াছি, তাহার প্রতি যদি ঘৃণা জন্মাইয়া দিতে পারি, তবে অন্নের জন্য তাহাদের কখনই দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না। বুনো রামনাথ তেঁতুলপাতার ঝোল, ও রঘুনন্দন ঘাটপিণ্ডমাত্র ভক্ষণে যদি মস্তিষ্কবিহীন ও মনুষ্যত্ববিহীন না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উপকরণের অভাবে আমাদের মস্তিষ্ককে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে না। ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলে আহার্য্যের সুপারিপাট্যের প্রয়োজন হয় না। পরিধান সম্বন্ধেও তাই। লজ্জা নিবারণই যদি পরিধানের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা অল্প মূল্যের মোটা তাঁতের কাপড় কিনিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারি। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতামহগণ কি করিতেন? সম্মানে ও জ্ঞানে আমরা কিছু তাঁহাদের অপেক্ষা বড় হইয়া উঠি নাই!

ধর্ম্মময় জীবন ও জীবন সংগ্রাম।

ধর্ম্মময়জীবন-যাপন যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারা টিকিতে পারেন না, একথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শুনিয়াছি। কিন্তু এ যুক্তি কোন কাজেরই নহে। যাঁহাদের জীবন ধর্ম্মময়, তাঁহারাই বরং সমধিক সুখে আছেন, একথা প্রমাণ করা কঠিন নহে। কোন্ প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি কষ্ট পাইতেছেন বা পাইয়াছেন? ২।১টি বিরল ঘটনাকে বিরুদ্ধ সাক্ষ্যস্বরূপে এখানে উপস্থিত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই দৈববিড়ম্বনার মূলে অন্য কোন সূক্ষ্ম রহস্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। যদি কোন সুচতুর রহস্যজ্ঞ

ইহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তবে ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, "হৃদয় যদি দুরাকাঙ্ক্ষায় আচ্ছন্ন না থাকে, অভাবকে সঙ্কোচ করা যদি হীনতা ও দুরদৃষ্ট বলিয়া গণ্য না করা হয়, তবে ধার্ম্মিকদের কখনও কষ্ট হইতে পারে না। সাধুভক্তেরা যেমন আপনাদের অভাবকেও সঙ্কোচ করেন, তেমনি অল্পের মধ্যে দক্ষতার সহিত সংসার বেশ স্বচ্ছন্দে চালাইতেও পারেন। সাধারণ লোক হইতে এই জন্যই ধার্ম্মিকেরা বড়। সাধারণ লোকেরা যেখানে বুদ্ধির অল্পতাবশতঃ প্রচুর উপকরণেও কুলাইতে পারে না, ধার্ম্মিক জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা স্বল্প উপকরণেও সকলের বেশ সন্তোষ জন্মাইতে পারেন। ইহা তাঁহাদের ঈশ্বরানুকূল বুদ্ধিপ্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল। গীতায় ভক্তের লক্ষণ এই :—

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥"

আর যদি স্বধর্ম্মে থাকিয়া বিনাশের সম্ভাবনা বলবতী হয়, তবে তাহাও শ্রেয়ঃ। শ্রীভগবান্ নিজমুখে আমাদিগকে একথা শুনাইয়া গিয়াছেন। এই সকল নিষ্ঠাবান্ লোকদিগকে যাহারা অবহেলার চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদা আছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না। তাঁহাদের অবহেলাতে নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানী ব্রাহ্মণের কিছুই আসিয়া যায় না;

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ লোকদিগের প্রতি বর্ত্তমান জনসমাজের অবহেলা।

কারণ তাঁহারা বাহ্য ধন-সম্পদ্ ও সম্মানকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছেন। তা ছাড়া যথার্থ নিষ্ঠাবান্, উদার, জ্ঞানী, বিদ্বান্, সাধনসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে কেহ অবহেলা করিয়াছে কি না, আমি জানি না। যে ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা আছে, সদ্বিদ্যালব্ধজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠা আছে, সেই দেবোপম ব্রাহ্মণের অপমান করিতে কাহারও সাধ্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে আত্মমর্য্যাদাবিহীন, লোভী, মূর্খ ব্রাহ্মণকে সমাজে কেন মানিবে? যাহাদের আত্মসম্মান নাই, লোকে তাহাদিগকে মান দিয়া, মান দেখাইয়া কতক্ষণ মাননীয় করিয়া রাখিবে? ক'টা লোক দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণপরমহংস, ভাস্করানন্দ, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ, শশধর, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, তিলক, দয়ানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি, কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে? সদাচারী, বিদ্যাবুদ্ধি-হীন পুরোহিতকে সম্মান করায় সমাজেরই গৌরবহানি হয়। সদ্বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন পুরোহিতগণ এখনও জনসমাজের সম্মান আকর্ষণ করিতেছেন।

উপসংহার।

আমার প্রাণের কথা এই—আমি সেই নির্ভীক ও তপঃসম্পন্ন দ্বিজাতি কুল চাই—যাঁহারা ত্যাগের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, সৎসাহসের দ্বারা, ও ভক্তি-প্রেম দ্বারা আমাদের পূর্ব্ব গৌরবকে আবার সঞ্জীবিত করিয়া দিবেন! তপস্যার দ্বারা ও ত্যাগের দ্বারা যাহা লভ্য, তাহা যাঁহারা নিজের জীবনে দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাইবেন, আমি সেই

তপস্তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বরিষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের পুনরভ্যুদয়ের কামনা করি! আমরা যদি চেষ্টা করি, আমরা যদি আমাদিগকে প্রস্তুত করি, তবে এই সিদ্ধর্ষিব্রহ্মর্ষিসেবিত ভারতবর্ষে আবার যে তাঁহাদিগের অভ্যুত্থান হইবে না, এ বিশ্বাসকে আমি কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারি না! তবে তজ্জন্য আমাদিগকে যথাসম্ভব তপস্যা করিতে হইবে, ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে!

দ্বিতীয় কাণ্ড।

গার্হস্থ্যাশ্রম।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

স্বধর্ম্মপালন, ও তাহার অন্তরায়।

ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্য। ব্রহ্মচর্য্য যেমন সকল আশ্রমের ভিত্তি-ভূমি, গার্হস্থ্য তেমনি সকল আশ্রমের আশ্রয়স্থল। "স্বধর্ম্মে থাকিয়া নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ" ভগবানের এই পরম কল্যাণকর বাণী আমাদের মঙ্গলদায়ক হউক! যেন এই মহাবাক্যে আমাদের অন্তরের জড়তা, বিষাদকালিমা মুছিয়া যায়! স্বধর্ম্মপালন করিতে গিয়া পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে, যখন-তখন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভ্রুকুটিভঙ্গি আছে, সময়ে সময়ে এত অনিবার্য্য দুঃখরাশি স্রোতের মত আসিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে যে, প্রাণ আর্ত্তস্বরে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িবে; তথাপি স্বধর্ম্মকেই অনুসরণ করিতে হইবে, পরধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইলে চলিবে না। কারণ তাহা আশু সুখপ্রদ হইলেও তাহার ভবিষ্যৎ বড় ভয়ানক! ক্ষুভিত দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়কুল আমার জীবনতরণী:ক যে কালসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে, তাহা যেন কখন বিস্মৃত না হই!

স্বধর্ম্মপালন, ও তাহার অন্তরায়।

আমরা দেখিতে পাই, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা দুইটি প্রধান জিনিস পাইয়াছি—এই শরীর, আর এই মন। ইহাই ভগবানের দান। এই শরীর-মনের দ্বারা আমরা অনেক কিছু পাই। কিন্তু কিছু পাইতে হইলে এই শরীর মনের উৎকর্ষ (culture) করা প্রয়োজন; নচেৎ ইহাকে কাজে লাগানো কঠিন। যদি ইহাদের দ্বারা, কোন কাজ না পাওয়া যায়, তবে ইহা বোঝার মত কষ্টদায়ক হয়। সুতরাং, শুভলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই শরীর-মন দ্বারা যাহা লভ্য, তাহা লাভ করিবার জন্য উদ্যোগী হইবেন। একজন মনস্বী বলিয়াছেন, "ফল যেমন পাকিলে সহজে খসিয়া পড়ে, তজ্জন্য কোনখানে বৃক্ষকে বেদনা অনুভব করিতে হয় না," তদ্রূপ এই শরীর-মনের সাধন করিতে করিতে যখন বেশ জমিয়া উঠে, তখন পরিপক্ক ফলের ন্যায় আত্মা শরীর হইতে সহজে খসিয়া পড়ে, তাহাকে তখন কোন বেদনা অনুভব করিতে হয় না। তাহার পূর্ব্বে খসাইতে গেলেই একটা গোল বাধিয়া যায়। সংসার হইতে মনকে বা শরীর হইতে আত্মাকে খসাইবার সাধনাই সংসার। সংসার-আশ্রমেই ইহার সমস্ত আয়োজন ঠিক রাখিতে হয়। ফল খসিয়া পড়িলেই যেমন সে বৃক্ষ হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ মানবের চিত্ত যখন শরীরবন্ধন হইতে খসিয়া পড়িবে, তখনই সে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসের উপযোগী হইবে। নচেৎ কাঁচা ফল পাকাইলে যেমন মিষ্ট হয় না, তদ্রূপ সংসার হইতে একেবারে বলপূর্ব্বক আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের আশা রাখে, তাহার পরিণামও সব সময়ে তদ্রূপ মিষ্ট হয় না। যখন ভীম প্রভঞ্জনের

আলোড়নে দিগ্‌, দিগন্ত ধূলিময় হইয়া উঠে, চতুর্দ্দিকে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির প্রচণ্ড তাণ্ডবে, আকাশ ও আলোক আচ্ছাদিত হইয়া যায়, তখন আকাশের সুনীল শান্ত নির্ম্মল ভাবটি আর মনে পড়ে না। কিন্তু ঐ প্রচণ্ড বাত্যা কালে প্রশান্ত হয়, এবং দিক্ সকল নির্ম্মল হয়; আবার প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করে, এবং আবার জগতের শ্যামল শোভার অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সংসারের কর্ম্মময় তাণ্ডবে, অভিমানের প্রচণ্ড বাত্যায় সবই ধূলিধূসরিত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই প্রচণ্ড আন্দোলনের পরেই বিশ্রামের যে শুভ্রোজ্জ্বল শান্ত-নির্ম্মল মূর্ত্তি প্রকাশ পায়, তাহা দেখিলে সংসার হইতে চিত্তকে বিমুখ করিবার ইচ্ছা হয় না। চঞ্চল জলে প্রতিমূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যায় সত্য, কিন্তু স্থির জলে প্রতিমূর্ত্তি স্পষ্টই দেখায়; সেইরূপ যিনি সমস্ত কর্ম্মের ভীষণতার মধ্যে আপনাকে লইয়া যাইতেছেন, যাঁহার ক্রমে ক্রমে সমস্ত আশা ও বাসনার চাঞ্চল্য আত্মাতেই আসিয়া স্থির হইয়া মিলিয়া যাইতেছে, এবং যিনি কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও যোগমগ্ন হইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ে আত্মার সৌম্য-শান্ত সমুজ্জ্বল চিত্র সমস্ত বাসনাতরঙ্গ মথিত করিয়া নির্ম্মল কিরণে ভাসিয়া উঠে।

যাহারা সংসার করিতে আসিয়া সংসারকেই প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরে, তাহাদের নিকট সংসারের অভ্যন্তরের এই সত্যমূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিতে পারে না; সংসার তাহার বাহিরের সুখ-দুঃখের সমস্ত ভীষণতা লইয়া তাহার কাছে জমিয়া বসে। কেন? কারণ সে সত্যকে চাহে না; এই ভব-সংসারের নাট্যশালায় যিনি প্রধান

নেতা—"যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী"—যাঁহা হইতে এই সংসার-বাসনা প্রসারিত হইতেছে, সেই পরম পুরুষকেই সে ভুলিয়া যায়।

সংসারের বাহিরের মূর্ত্তিটিই ভোগের মূর্ত্তি; সংসারের সেই দিকটি-তেই ভোগের আয়োজন। যিনি ইহা বুঝিয়া বিষয়দ্বারা চিত্তকে অভিভূত হইবার স্বল্প অবসর দেন, তিনি এই সংসারেই তাঁহার সত্য মূর্ত্তিকে দেখিতে পান। আর যেখানে সত্য, সেখানেই তো শিব! সুতরাং সংসারে থাকিয়া ঠিকমত চলিতে পারিলে অকল্যাণ-লাভের কোন আশঙ্কা নাই। এই সত্য তখন সংসারে এবং সংসারের বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করেন। এই সত্য জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্রই আপনার মহিমা বিকীর্ণ করিতেছে। সংসারের সর্ব্ব-প্রকার প্রেমের ও প্রীতির বন্ধনের মধ্যেও সত্যের ও মঙ্গলের এই জয়-গীত নাদিত হইতেছে। মঙ্গলের মহিমায় সমস্ত দিক্ শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে; জীবনে, মরণে, সুখে, দুঃখে, শান্তি ও শোকে সর্ব্বত্রই ভগবানের সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

সমস্তের মধ্যে এই মঙ্গলকে দেখিতে পাওয়াই মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য; সংসারের মধ্যে তাঁহার এই শিবসুন্দর ভাবকে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিলেই সংসারের শিক্ষা সার্থক হয়।

এইরূপে আদর্শ গৃহী তাঁহার গৃহকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করেন। যে "গৃহ" বলিতে অত্যাশ্রমীদের বিভীষিকা জন্মে, সেই গৃহ তখন আশ্রমশোভা ধারণ করে, গৃহবাসীদের পুণ্যপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাহার স্নিগ্ধ পবনে চতুর্দ্দিকে পুণ্যের মুকুল ফুটিয়া উঠে। তখন গৃহকে আর বন্ধনের স্থান বলিয়া ভয়ে ভয়ে

চলিতে হয় না, গৃহতটে তখন মুক্তির তরঙ্গ স্ফীতবক্ষে নৃত্য করিয়া উঠে।

প্রাচীনকালে গৃহধর্ম্মকে ঋষিরা অবহেলা করেন নাই, বরং সকল আশ্রমের চেয়ে ইহারই স্থান উচ্চ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥"

ঋষিরা যে আশ্রমের এত মান বাড়াইয়া গিয়াছেন, আজ আমাদের কর্ম্মদোষে তাহার স্থান কি দারুণ কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে প্রতিপদক্ষেপে সতর্ক না হইলে বিপজ্জালে জড়িত হইবার আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। কেন আমরা সংসারকে ভয় করিব? কেন আমরা তাহার মুখোস-পরা মুখ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিব? আমরাই সংসারের মুখে কালিমা মাখাইয়া তাহার অঙ্গশোভাকে বিবর্ণ করিয়াছি! তাই সে আজ আমাদের চিত্তে শান্তি দেয় না; তাহার সুমধুর কল্যাণময়ী মূর্ত্তি আজ আমাদের নিকট তাই শোভাহীন!

এই কালিমা যখন আমরাই মাখাইয়াছি, তখন নিজ হস্তেই সে কালিমা ধুইয়া মুছাইয়া যাইতে হইবে; আমাদেরই কর্ম্মদ্বারায় পুনর্ব্বার ইহাকে স্বর্গের পারিজাতগন্ধামোদিত নন্দনকাননে পরিণত করিতে হইবে!

ইহা কি নিতান্তই দুরাশার কথা? আমরা যদি প্রত্যেকে স্বধর্ম্ম পালন করি, ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের যথেচ্ছ কর্ত্তৃত্বকে সাধনদ্বারা সংযত করি, তবে এই সংসারকেই আবার স্বর্গ করা চলিবে না কেন? সংসার তো আর ভগবান্‌কে ছাড়িয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নয়,

ভগবানের মঙ্গলমূর্ত্তি ইহার মধ্যেও বিরাজমান; আমরাই মোহঘোরে অচেতন হইয়া তাহা এতদিন দেখিতে পাই নাই। যে কুহকিনীর কুহকজালে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া ছিলাম, যে মায়ার প্রচণ্ড প্রতাপে আমরা মাথা তুলিবার অবসর পাই নাই, আজ যদি তাহা অপগত হইয়া থাকে, আজ যদি অবকাশ আসিয়া থাকে, সুবাতাস বহিয়া থাকে, তবে আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, এস আমরা তাঁহার পাদপদ্মের উদ্দেশে এই জীবনতরণীকে ভাসাইয়া দিই!

সকল কাজ করিব, সব দুঃখ সহিব, তাঁহার বিশ্ববিমোহন মূর্ত্তিকে স্মরণ করিয়া! কোন্ অনন্ত অতীত কাল হইতে তাঁহার আকুল বাঁশরী এই বিশ্ববাসীকে তাঁহার দিকে আহ্বান করিতেছে! তাই দিগ্‌দিগন্তে এত শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে, নভোমণ্ডলে তাঁহার সুনীল অঙ্গশোভার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মনপ্রাণ আকুল করিতেছে, চন্দ্রের সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না তাঁহার নির্ম্মল নীরব হাস্যে ভরিয়া উঠিতেছে, এবং ফুটন্ত কুসুমের বিমল সৌরভে তাঁহার গাত্রগন্ধ আজ আত্মহারা করিয়া তুলিতেছে! আজ আর অন্ধকার নাই, কিছুই অজানা নাই, আলোয় আলোয় সব কুল, সব দিক্ মাতিয়া উঠিয়াছে! আজ সত্যই কি, হে অন্তর্য্যামী! তুমি আমার অন্তরে বসিয়া নব-নব সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে আমার মনকে মুগ্ধ করিতেছে? আজ যে ধরণী নব বধূবেশে তোমারি অপেক্ষায় বসিয়া আছে! আজ সমস্ত জীবনের প্রবাহ উদ্বেল হইয়া তোমারি পানে ছুটিয়া চলিয়াছে! হে দেব! হে অন্তরতম! আজ কি আমাদের মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিবে? আমরা কি প্রস্তুত হইতে পারিয়াছি?

যদি গর্ব্ব মাথা তুলিয়া থাকে, হৃদয় আমার সাড়া না দেয়, তবে এ জাগ্রত করাইবার ভার তোমারই উপর রহিল! যে অন্ধ, সে কি আলোক পাইবে না? যে পথহারা, সে কি তোমার ভবন-দ্বারে আসিতে পাইবে না? তুমি বুঝাইয়া দাও, নাথ! সংসার করা আমাদের সহজ হ'ক! আমি যে সংসারের কেহ নই, আমার ক্ষুদ্র অহংকার যে কিছু নয়, তোমার পানে তাকাইয়া তাহা যেন বুঝিতে পারি! তুমিই এই সংসারের, তুমিই এই বিশ্বের পরমাশ্রয়! আমি সমস্ত আশাকে পরিহার করিয়া তোমার চরণকে নিবিড়ভাবে যেন আশ্রয় লাভ করিতে পাই! আমার আত্মাতে যেন কোন গ্লানি, কোন তাপ না থাকে! আজ যেন আমার এই অকিঞ্চিৎকর অভিমান তোমার বিশ্বাত্মার মধ্যে লুটাইয়া পড়ে, আমার আত্মা পরমাত্মার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে!

এই সংসারে থাকিয়া আমি যেন কোন কর্ম্মের ভারকে বা ক্লেশকে ভয় না করি, আজ যেন অন্ধ উন্মত্ত আবেগে আমি আমার বাসনার পিছনে পিছনে ছুটিয়া না চলি!

আজ আমাকে বল দাও, প্রভু! আমি যেন সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্যকে তোমার আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিতে পারি! আজ যে অভাগা চোখের জলে বক্ষ ভাসাইতেছে, তাহাকেযেন দুটি সান্ত্বনার কথা শুনাইতে পারি! তোমার ঐশী শক্তি যেন তোমার দিকে আমাকে জোর করিয়া টানিয়া রাখে! আজ তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আর যাহা দাও নাই, তার জন্য চিত্তে যেন কোন বিরোধ-দ্বন্দ্ব না আসে! আজ যেন আমরা সহাস্যমুখে প্রসন্নচিত্তে তোমার সমস্ত আদেশকে

শিরোধার্য্য করিতে পারি! শুধু যেন এই প্রার্থনা আমার হৃদয় হইতে ধ্বনিত হয়—"অঁসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামমৃতং গময়। আবিরাবির্ম এধি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

——:০:——

বর্ত্তমানকালের সংসারধর্ম্ম।

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাৎ ত্রয়োহপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥" মনু

ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি মনুর উপরি উক্ত শ্লোকগুলির প্রতি অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, গৃহস্থের প্রকৃত ধর্ম্মই বা কি, এবং তাহার উদ্দেশ্যই বা কি ?

বলা বাহুল্য, ঋষিরা কোন কাজই লক্ষ্যহীন হইয়া করিতেন না। সমস্ত কাজের মধ্যেই, সমস্ত নিয়ম প্রণালীর মধ্যেই তাঁহাদের সেই চিরন্তন লক্ষ্যটি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত। তাঁহারা লক্ষ্যকে কথনই ভুলিতেন না। যখনই কর্ম্মভার হইতে মুক্তি পাইয়া সন্ধ্যার সুনির্ম্মল আকাশের দিকে তাঁহারা তাকাইতেন, তখনই তাঁহাদের অন্তস্তল হইতে এই প্রশ্ন ফুটিয়া উঠিত :—

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥"

এই প্রশ্নে শিরায় শিরায় যেন কোন অনির্ব্বচনীয় অন্তরতম আত্মীয়ের বিরহব্যথা মন-প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া দেয়; হৃদয়তটে এই একমাত্র প্রশ্ন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আঘাত করিতে থাকে; সংসারের শত কাজে আবদ্ধ চিত্ত মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত বাঁধনকে টানিয়া, সরাইয়া ফেলে; এবং সমস্ত বিস্মৃতি টুটিয়া হৃদয়ে কি এক অনির্ব্বচনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে!

ঋষিরা জানিতেন, জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় কি। ইহাই শিখাইবার জন্য তাঁহাদের এই চারিটি আশ্রম। তাঁহারা আমাদের সম্মুখের এই কর্ম্মক্ষেত্রের বিচিত্র রঙ্গভূমিকে অস্বীকার করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইবার উপদেশ দেন নাই, বা পরম অবজ্ঞাভরে ইহা হইতে আপনার চিত্তকে বিমুখ করিয়াও রাখেন নাই। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন কর্ম্মফলে আমরা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা হইতেই যতটা মঙ্গল লাভ করা চলে, তাহারই চেষ্টা দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ পৃথিবী সহজ ক্ষেত্র নয়; এ মায়া-পুরীর ধাঁধাঁয় পড়িয়া কত পান্থ কত যাত্রী যে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। তাই লোকের দুঃখে ব্যথিত হইয়া ঋষিরা ইহার কবল হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শীঘ্রই আবিষ্কার করিলেন, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উন্মোচনের ন্যায় এই সংসারের মধ্যে থাকিয়াই ইহার মায়াগণ্ডী হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারা যায়। তাহা এমন একটি পথ যে, তাহা ধরিলে আর পরিত্রাণের জন্য ভাবিতে হয় না।

ঋষিরা দেখিয়াছিলেন, এই সুচঞ্চল কর্ম্মস্রোতের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে একটি চিরস্থির চিরনির্ম্মল স্থান রহিয়াছে, যেখানে পৌছিলে ভগবানের চরণচ্যুত শান্তিধারা মন-প্রাণকে সুশীতল করিয়া দেয়, শতবন্ধনে জড়িতচিত্তকে বাঁধনহারা করিয়া দেয়। সংসারের রাক্ষসী মায়া সেখানকার ছায়াপর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না!

সেই নিত্য সত্য ধামে উপনীত হইয়া তথা হইতে তাঁহারা পথভ্রান্ত পথিককে পথ নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কাজের পরিণাম তাঁহারা স্পষ্ট চোখের সামনে দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা দিব্যচক্ষে দেখিলেন, লোকের গৃহস্থ হওয়া দরকার কেন এবং গৃহী হইবার কেই বা উপযুক্ত পাত্র?

বর্ত্তমানকালের সংসারধর্ম্ম।

আমরা আজ কাল যেরূপ ভাবে জীবনযাপনকে সংসারধর্ম্ম বলি, তাহা প্রকৃতই সং-সার! অথবা সংহার নাম দিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাহা সংসার-ধর্ম্ম নাম পাইবার যোগ্য নয়।

সংসার-ধর্ম্ম যথার্থ কি।

ধর্ম্ম কি? যাহা আমাদিগকে প্রাণের দিকে, মুক্তির পথে লইয়া যায়। সংসারধর্ম্মও ঠিক তাহাই হইবে, যাহা হইলে আমরা মুক্তির সোপানে উঠিতে পারিব।

সংসারধর্ম্ম বলিতে গেলে, কেবল যে ঘরকন্না করা, টাকা রোজগার করা, আর ভূতের বোঝা বহে' মরা, তাহা কখনই নয়। যদি বাস্তবিকই এই সং-সাজামাত্র সার হয়, তবে এ

ভূতের বোঝা যত শীঘ্র স্কন্ধ হইতে নামে, ততই মঙ্গল। কিন্তু বাস্তবিক সংসার বোঝামাত্র নহে, ইহা আমাদের মুক্তির সোপান!

সংসারে আমরা কি পাই?

কোনখানে আমরা স্নেহ, প্রেম, দয়া, ভক্তি শিখিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল করি; কোনখানে বা আমরা কত বিচিত্র সম্বন্ধে জড়িত হইয়া তাহারই মধ্যে মুক্তির অবকাশ দেখিয়া সুখী হই। অবশ্য সংসারে বিবিধ প্রলোভন, কত সংগ্রাম, কত দাহ, কত রোগ, কত নির্য্যাতন, কত শোক আমাদের অন্তরাত্মাকে আকুল করিয়া তুলে; কিন্তু এই বিবিধ উৎপাত আছে বলিয়াই আমরা মুক্তির সুখের জন্য লালায়িত হই।

সংসারের দুঃখ-কষ্টই মুক্তির হেতু।

সুতরাং, যে সংসার আমাদিগকে প্রতিদিন বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে ফেলিয়া ও বিচিত্র ভোগের মধ্যে রাখিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথকে লোভনীয় করিয়া তুলিতেছে, আমরা কখনই তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

ধর্ম্মের আংশিক গ্রহণ এবং তাহার পরিণাম।

আজকাল ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া নিজের মনের মত গড়িয়া পিটিয়া ধর্ম্মকে মুখরোচক বা চলনসহি করিয়া লইবার একান্ত আগ্রহ জনসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। কেন যে আমাদের এ প্রবৃত্তি হয়, ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, আমরা শরীরে ও মনে বড় দীন হইয়া পড়িয়াছি। আরণ্যক

ঋষিদের মত স্পষ্ট করিয়া সহজ সত্যকে সহজভাবে আর আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। তাই আমরা দারিদ্র্যপীড়িত ভিক্ষুকের ন্যায় সম্মুখে যে দানটুকু পাই, তাহা অযশস্কর হউক, লইবার অযোগ্য হউক, তবুও আমরা তাহা ছাড়িতে পারি না। এই যে এত স্বল্পে সন্তোষ, ইহা সন্তোষামৃত-পানের ফল নহে, ইহা ঘোর তামসিকতার চূড়ান্ত সীমা!

কেন আমরা একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, যাহা যথার্থ সত্য, যাহা যথার্থ ধর্ম্ম, যাহা অন্তরাত্মার স্থায়ী কল্যাণ, আমরা সেই পথ বাহিয়া চলিব! তাহা দুঃসাধ্য হউক, দুরধিগম্য হউক, তাহাকেই আমরা প্রাণপাত করিয়া লাভ করিব!

ধর্ম্মের পথ।

কোনো দিনই তো কোনো সাধন সহজ হয় না। সুতরাং সংসারধর্ম্মের সাধনাই বা কেন সহজ হইবে? যাহা ধর্ম্মের পথ, তাহা চিরকালই ক্ষুরের ধারের ন্যায় শাণিত ও দুরতিক্রম্য। তাই এ পথের যাত্রীর সংখ্যা কখনও মাত্রা ছাপাইয়া উঠিতে দেখা যায় না।

ধর্ম্মের প্রাণ।

কিন্তু তখনি ইহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার হইয়া উঠে, যখন আমরা ধর্ম্ম সাধন করি না, অথচ তাহার একটা ভাণ করি, এবং অকাতর চিত্তে সেই ভাণটাকেই আবার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করি। তখন আমরা যে আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতার কত নিম্ন সীমায় উপনীত হই, তাহা বুঝিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না!

আন্তরিক দুর্ব্বলতাই আমাদের কষ্টের কারণ।

যে দুর্ব্বলতার জন্য আমরা কতযুগ ধরিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি, অথচ তাহার প্রতীকারের পথ থাকিলেও, তাহা কষ্টের পথ বলিয়া সেদিকে ভিড়িতেছি না, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, দুর্ব্বলতা কতটা গভীরভাবে আমাদের শরীর মনকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে!

জড়তা।

আমাদের অন্তরাত্মা অনেক সময়ে যাহাতে সায় দেয়, তাহা আমরা কার্য্যকালে করিয়া উঠিতে পারি না। এক সময়ে যাহাকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য বলিয়া ভাবিয়াছি, অনেক সময়ে তাহাকেই আবার বিস্মৃত হইতে পারিলে বাঁচি বলিয়া মনে হয়!

আরামের দিকে দৃষ্টি।

এই যে কোন রকম কষ্টের দিক না মাড়ানোর একটা একান্ত ইচ্ছা, ইহা কখনই সরল অধ্যাত্মবলের নিদর্শন নহে। পূর্ব্বকালে আর্য্যবালকেরা ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে কঠোরতার মধ্যে আপনাদের জীবনকে সংগঠিত করিয়া তুলিতেন, এবং উত্তরকালে যখন তাঁহারাই গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে এতটা শক্তি সঞ্চিত থাকিত যে, তাহারি বলে তাঁহারা যুদ্ধে ডরাইতেন না, মরণে ভয় আসিতে দিতেন না, সর্ব্বস্বত্যাগেও কুণ্ঠা আসিতে দিতেন না— সকল অবস্থাতেই তাঁহারা আত্মার মহীয়সী শক্তিকে উপলব্ধি

ব্রহ্মচার্য্যের কঠোরতার উপকারিতা।

করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সমস্ত বিপদ্-আপদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতেন। এই সকল বলবান্ পুরুষেরাই সংসারসংগ্রামে বিজয়ীর সম্মানলাভের যোগ্য!

আর আমরা? জীবনের প্রভাত কাল হইতেই কেবল আরামে থাকাকেই আদর্শসুখ বলিয়া মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম-প্রণালীর মধ্যে নিজের জীবনকে নিয়মিত করি নাই, কোন দিনই আপনাকে মাজিয়া-ঘসিয়া, গড়িয়া-পিটিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া তুলিতে ইচ্ছাও করি নাই; তাই যখন জীবন রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে ভরিয়া উঠে, একটি-একটি করিয়া আশার প্রদীপ নিবিয়া যায়, তখন আমরা সম্মুখে-পিছনে, উপরে-নিম্নে, ও অন্তরে-বাহিরে, অন্ধকার দেখিয়া শিহরিয়া উঠি! দিনের আলোকে যাহা সহজে করা চলিত, তাহা রাত্রির অন্ধকারে অত্যন্ত জটিল বলিয়া মনে হয়!

আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনস্বী বলিয়াছেন, "গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ যেমন ধীরে ধীরে দিনের পর দিন খাদ্য ও বল সংগ্রহ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করে, ও পরে যখন পৃথিবীর আলোকে জল বায়ু সহ্য করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তখনি সে গর্ভের সুকঠিন আবরণ সবেগে উন্মোচন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে, তাহার পূর্ব্বে নহে; কিন্তু ভ্রূণের কঠিন বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবার শক্তি পাইবার পূর্ব্বেই দুর্দ্দৈববশতঃ যাহাকে পৃথ্বীতলে আসিতে হয়, অকালে মৃত্যুই তাহার একমাত্র পরিণাম।"

এইরূপ জীবনের প্রভাতকালে মানব আপনাকে একটা কঠিন সংযমের আবরণে আবৃত করিয়া না রাখিলে, সংসারের দূষিত জলবায়ু তাহার ক্ষুদ্র প্রাণকে বাড়িতে না দিয়া অকালে ধ্বংসের মুখে উপনীত করে; সফলতালাভ তাহার পক্ষে নিতান্তই সুকঠিন হইয়া পড়ে। এইজন্যই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর সংসারাশ্রমের ব্যবস্থা ঋষিদিগের অসামান্যবুদ্ধিপ্রসূত!

সফলতালাভের আদর্শ।

অবশ্য সকলের জীবনই যাহাতে সফল হয়, ইহা আমরা সকলেই ইচ্ছা করি। কিন্তু সফলতা-লাভ করিতে হইবে বলিলেই সকলকেই যে এক একজন কেশবচন্দ্র সেন, বিদ্যাসাগর, বা রামকৃষ্ণ পরমহংস হইয়া উঠিতে হইবে, তাহা নহে; যে-কেহ তাহার নিজের জীবনকে সুনিয়মে পরিচালিত করিয়া তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র চেষ্টাটুকুকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া তুলিবে, আমি তাহারই জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করি। তাহার প্রতিভা, যশ, অর্থ বা বিদ্যার আধিক্য না হইলেও, ক্ষতি নাই। সকলকেই যে হৈ হৈ করিয়া স্বদেশ-উদ্ধারে ব্রতী হইতে হইবে, বা নেতা হইয়া বক্তৃতার ধূমে দিগ্‌দিগন্ত অন্ধকার করিয়া তুলিতে হইবে, এমন নহে। সবাই কিছু প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। যাঁহাদের প্রতিভা আছে, তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য তাঁহারা করুন। জনসাধারণ যেন অতি সাদাসাপটা ধরণে আপনার জীবনকে চালাইয়া লইয়া যায়, শুধু যেন সে তাহার চিরন্তন লক্ষ্যের পথটিকে ভুলিয়া না যায়! সে যেন সত্যের পথে মনকে সুদৃঢ় রাখিয়া নির্ভয়ে বিশ্বের

যে কোনোখানে দাঁড়াইয়া প্রণতচিত্তে বিশ্বদেবতার চরণতলে নীরবে প্রত্যহ নিজের ক্ষুদ্র প্রাণটিকে সমর্পণ করিয়া দিতে পারে।

ইহাতেই জীবনের চরম সার্থকতা এবং এ অধিকার সকলেরই আছে।

অধিকারী।

এই অধিকার লাভ করিতে গেলে, মানুষকে নিজের চিত্তের প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয় এবং সকলদিক দিয়া সংযম ও ত্যাগকে অভ্যাস করিতে হয়। আমি মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি; মানুষের যে অধিকার, তাহা পূরাপূরি লাভ করাই মনুষ্যজীবনকে সার্থক করিবার উপায়। সে সার্থকতা লাভ করিতে হইলে ব্যবসা-বাণিজ্যের হুঁড়াহুড়ি করিতে হয় না, বিলাস-বিভ্রমের ঢলাঢলি করিতে হয় না, এবং টাকা পয়সারও ছড়াছড়ি করিতে হয় না। মানুষ হইবার আশা যেখানে প্রবল, সেখানে কোন ছলনা নাই, তাহা সরল সত্যের পথ, সেখানে কোন বিদ্বেষবহ্নির সংহারমূর্ত্তি নাই; কোন প্রকার ঢাকিয়া ঢুকিয়া বাহিরে রং ফলাইয়া দেখানোর প্রবৃত্তি নাই; সেখানে সমস্তই মঙ্গল, সমস্তই কল্যাণ! সেখানকার একমাত্র ভাবই হচ্চে "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" এখানে বাহিরের জাঁক-জমক চিত্তকে চপল করে না, এবং কোন দুরাশাও চিত্তকে বেষ্টিত করিয়া রাখে না; এখানে ব্রহ্মের পদলাঞ্ছিত শান্তি ভক্তের শরীর ও মনকে সুদৃঢ়ভাবে স্পর্শ করে, ও সেই জন্যই তাঁহার কোন ক্ষোভ নাই, কোন দুঃখ নাই ও কোন ব্যর্থতায় নৈরাশ্য নাই!

নীরবে কাজ করা এবং কাজ করার সুখ-দুঃখকে নীরবে স্বীকার করিয়া লওয়ার যে একটা বিশেষ গৌরব আছে, তাহা আমরা অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাই আমরা অনেক সময় স্বকৃত কর্ম্মের তালিকা লোকের সমক্ষে মহাসমারোহে হাজির করিয়া প্রশংসা পাইবার জন্য লোকের মুখপানে চাহিয়া থাকি, এবং অনাবশ্যক চেঁচাইয়া-মেচাইয়া আপনাকে জাহির করিবার প্রবল চেষ্টাকে এবং লোককে বিস্ময়ান্বিত করিবার বিপুল প্রলোভনকে হাস্যরসের অভিনয়ে পরিণত করি।

নীরবে কর্ম্মকরা নিষ্কাম কর্ম্ম।

আমি কেন কাজ করি? আমাকে কাজ করিতে বলে কে? যদি সেটা নিতান্তই লোকের প্রশংসালাভের জন্য করিয়া থাকি, তবে আমার অনেকখানি পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে বলিতে হইবে। কারণ লোকের মুখের কথা, আর বন্যার স্রোত একই, কোনটাই বেশী দিনের জন্য নহে।

কিন্তু যখন আমার প্রাণের ভিতর ব্যথা জাগিয়া উঠে, "কাজ"ই আমার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া সত্য বিশ্বাস হইয়া থাকে, তখন আমি কাজকে এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার অসুবিধাকে বিনম্র হৃদয়ে, অক্ষুব্ধ চিত্তে নিজের শির পাতিয়া দিই; তখন একটু করিয়া লোকের পানে তাকাইয়া থাকি না। তখন যথাসাধ্য করি, সাধ্যাতীত করি; কিন্তু তবু মনে হয় ঠিক করা হইল না, আরও কিছু করিলে হইত। বারবার ব্যর্থতার উপহাসকে অঙ্গের ভূষণ করি, তবু কাজকে ছাড়িয়া দিই না; চতুর্দ্দিকে ভর্ৎসনা ও ধিক্কার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবার

চেষ্টা করে, তবু "কর্ত্তব্য কর্ম্ম" না করিয়া শান্তি পাই না; কারণ সেখানে আমি কিছু পাইব বলিয়া লোভবশতঃ আসি নাই, আমি সেখানে যথার্থ ভাবে নিজেকে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি, ত্যাগের জন্য আসিয়াছি।

এরূপ অবস্থায় কর্ম্মকে শুধু কর্ম্মহিসাবেই দেখা হয় না, সেখানে কর্ম্মকে ত্যাগের সৌন্দর্য্য ও নির্ভরতার সৌগন্ধে পবিত্রতর-কল্যাণতর করিয়া দেওয়া হয়। তখন কর্ম্ম করার যে একটা ক্লেশ তাহা চিত্তে ভারের মত আসিয়া চাপে না, তখন "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা"—এইরূপ মনে হয় এবং ইহাতেই আমাদের প্রাণ যেন একটি যথার্থ শান্তি ও পরম আশ্রয়কে লাভ করে। এবং এইরূপে সম্পন্ন হইলেই কর্ম্ম ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হয়।

ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্ নিয়ম প্রতিপালিত না হইলে, গৃহস্থ হইয়া কখনই কেহ কর্ম্মের এই বিরাট্ ভাবকে মনে ধারণা করিতে পারে না; এবং কর্ম্মের গুরু ভার স্কন্ধে বহন করাও তাহার সাধ্যাতীত। সেইজন্যই যথার্থ শাস্ত্রানুমোদিত গৃহস্থ হইতে গেলে, ব্রহ্মচর্য্যের কতটা আবশ্যকতা তাহা সহজেই অনুমেয়।

ব্রহ্মচর্য্যবিহীন যুবকদিগের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা ও ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত যুবকদিগের চরিত্রগত সামর্থ্য।

যখন দেখি কোন লোক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার অবাধ্য, তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, তাঁহার কথা শুনে না ইত্যাদি, তখন আমার মনে সময়ে সময়ে বড় কৌতুক বোধ হয়।

সে তো কথা শুনিবেই না ; কথা শুনাইবার জন্য তুমি তাহাকে কি শিক্ষা দিয়াছ ? তোমার জনক-জননীর প্রতি তুমি শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন ছিলে কি ? শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "সংযম-শিক্ষা"য় বলিয়াছেন যে, বালকের জন্মিবার অনেক পূর্ব্বে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া উচিত, নচেৎ বাহ্যপ্রকৃতি এবং অন্তঃপ্রকৃতি সকলেই আমাদিগকে কুবাক্য বলিবে। কথাটা যে কত গভীর—কত সত্য তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। আমরাও দেখিতে পাই শ্রেষ্ঠ লোকমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ তাঁহাদের পিতা-মাতার চরিত্র; যেখানে ব্রহ্মচর্য্য, যেখানে তপস্যা, সেইখানেই সৎপুত্রের জন্ম ; নচেৎ যাহারা তপস্যাবিহীন, চরিত্র ও সদাচার-হীন, অবিশ্বাসী ও শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত, তাহাদের বংশধরগণ হইতে সুসন্তানের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নিতান্ত বিরল। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, বেদব্যাসের পুত্রই শুকদেব, সুভদ্রা-অর্জ্জুনের পুত্রই অভিমন্যু।

ঋষিরা যে এত কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতেন, তাহার মানে কি ? তাঁহাদের কি দয়া মায়া ছিল না ? লোকের বেদনা কি তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না ? সবই বুঝিতেন, কিন্তু তবুও মানুষ হইতে হইলে যে অত্যাবশ্যক কষ্টকে উপেক্ষা করা চলে না, তাহার জন্য তাঁহারা কেবল মাত্র স্নেহ দেখাইয়া শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ হইতে দিতেন না। তাঁহারা বুঝিতেন, যাহা শিক্ষা না করিলে চলিবে না, তাহা যতই কেন কঠোর হউক, তাহা করিতেই হইবে। এই যে নির্ম্মমভাবে তাঁহারা শিষ্যদের চরিত্রটিকে সুদৃঢ়ভাবে গড়িয়া দিতেন, তাহাতেই তাহারা উত্তরকালে অমরতা লাভ করিত। শিষ্যেরা

আশ্রম হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াও আরামের জন্য ব্যাকুল হইত না। সকল প্রকার কর্ম্ম এবং তাহার সমস্ত ক্লেশকে সহজভাবে বহন করিবার শিক্ষা তাহারা আশ্রম হইতেই লাভ করিত; সুতরাং সংসারে ফিরিয়া আসিয়াও কর্ম্মভারে তাহাদের চিত্ত কখনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিত না—সমস্ত ক্লেশকেই তাহারা বিশ্বদেবতার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া সহ্য করিতে অভ্যস্ত হওয়ায় কোন কিছুই তাহাদের চিত্তকে রসহীন কঠোর করিতে পারিত না।

এখনকার কালে যে গোড়াতেই গলদ্। ব্রহ্মচর্য্য তো পালন করিই না, হঠাৎ মাঝখান থেকে সংসারী হইয়া বসি। কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন, আমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশই করিতে পারি না। যেমন দ্বিতল গৃহ প্রথমতলের উপরই প্রতিষ্ঠিত,—তাহার পক্ষে স্বাধীন ভাবে খাড়া থাকা একেবারেই অসম্ভব, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যব্যতীত গার্হস্থ্যাশ্রম নিতান্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

গার্হস্থ্যাশ্রমকে পরীক্ষাক্ষেত্রও বলা চলে। যে ছাত্র প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া সমস্ত সময়টুকু অধ্যয়নব্যাপারে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহারই পরীক্ষাতে আনন্দ ও উৎসাহ দেখা যায়; আর যে গোড়া হইতেই ফাঁকি দিয়াছে, তাহার পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াই বিড়ম্বনা। তদ্রূপ যে যুবা অসীম ধৈর্য্যের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত পাঠ শেষ করিয়াছে, যে ফুটন্ত পুষ্পের মত অটুট ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জীবনের সমস্ত সৌরভটুকু বিকসিত করিবার ও সমস্ত মাধুরীটুকু ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টাকে নিরন্তর সজীব রাখিয়াছে, যাহার মনে তেজ এবং শরীরে বল আছে, বুদ্ধিতে কোন জড়তা নাই, সরল

আধ্যাত্মিক বলে যে বলীয়ান্‌, সেই পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত পাত্র, গৃহী হইবার সেই যোগ্য। সেই গৃহীই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হয়, এবং তখনই সে জীবনকে কর্ম্ম ও চেষ্টা দ্বারা ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারে!

অন্যের সাধ্য কি আপনাকে সমর্পণ করে! যে জীবনকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সেই না জীবন দান করিবে! যে ইন্দ্রিয়ের দাস, যে আরামের ভৃত্য, তার সাধ্য কি সে জীবন সমর্পণ করে! নিজের জীবনে তাহার অধিকার কোথায়?

সমস্ত বাধা বিঘ্ন হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, দুর্ব্বার লোলুপ ইন্দ্রিয়কুলকে অধ্যাত্মবলের দ্বারা সুসংযত করিয়া জীবনের সমস্ত লক্ষ্যগুলিকে যে সেই এক বৃহৎ ব্রহ্মকেন্দ্রের অভিমুখ করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, যে কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয় ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শুচিতা, জ্ঞান, বিদ্যা, সত্যনিষ্ঠা ও অক্রোধকে আপনার মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সেই জীবনের সমস্ত দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে, বাসনার নিবিড় জটিল জাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনাতে আপনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই যোগযুক্ত অবস্থা। যাঁহার এই অবস্থা লাভ হইয়াছে, সেই সৌভাগ্যবান্‌ পুরুষের সম্বন্ধেই দেবর্ষি নারদ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—"স তরতি স তরতি, স লোকাং স্তারয়তি॥"

যখনই আমি দেখি, সদ্‌বিদ্বান্‌ সুসংযত গৃহস্বামী কত ধৈর্য্যের সহিত আপনার পুত্রকন্যাগুলিকে মানুষ করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন, কত বিচিত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে কত কঠোরতর দুঃখে

পতিত হইতেছেন, বহুযত্ন-লব্ধ বিত্তকে ত্যাগের দ্বারা সার্থক করিতেছেন, সংসারের আধিব্যাধি-জড়িত গৃহহীন অনাথের রোগ-মসীমাখা তনুগুলিকে পরম সমাদরে শুশ্রূষা করিতেছেন, যখন দেখি চতুর্দ্দিকে বিপদের ঘন-ঘোরঘটায় আচ্ছন্ন হইয়াও তাহারি মাঝে ভক্ত-সেবক আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার জীবনপুষ্পকে হৃদয়দেবতার নিকট অঞ্জলি দিতেছেন, বাহ্য বিপদের প্রবল ঝঞ্ঝা অকাতরে বিনম্র হৃদয়ে শির পাতিয়া বহন করিতেছেন, আবার যখন দেখি শ্রদ্ধানিষ্ঠ গৃহস্থ দেবসেবায় অতিথিসেবায় অনলস হইয়া পুত্রকন্যার সৎশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, গুরুজন ও আত্মীয় পরিজনকে শ্রদ্ধাভক্তির দ্বারা সৎকৃত করিয়া, প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবদের যথাসাধ্য দুঃখ মোচন করিয়া, কাহারও নিকট কোনও বিষয়ের প্রত্যাশা না রাখিয়া মৌনভাবে আপনার জীবনতরণীটিকে ভাসাইয়া দিতেছেন, তিনি তখন কোথায় যান? তখন তাঁহার জীবনতরণী ভাসিতে ভাসিতে ব্রহ্মসাগরেই আসিয়া পৌঁছে; তখন তিনি আপনার জীবননাথ অভীষ্টদেবের চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া এই জীবনের সমস্ত বোঝা সমস্ত কর্ত্তব্য তাঁহারই চরণপদ্মে নামাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন।

মানুষ এমনিটি করিয়া যদি আপনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে, তবে তাহার জীবন যতই বিরলঘটনাপূর্ণ হ'ক, তথাপি তার ক্ষুদ্র জীবনটির মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সুবৃহৎ সার্থকতার উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠে, এবং তাহা পৃথিবীর অনেক অভিমানী সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের পক্ষেও লোভনীয় হয়।

- তিনি আহারে বিহারে পরিচ্ছদে সংযত হইয়া, বিদ্যা ও জ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া আপনার জীবনযজ্ঞের পরিসমাপ্তি-কালে ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইয়া ভক্তিসহকারে মরিবার দিনে অনাড়ম্বরে অক্ষোভে আপনার জীবনটিকে পূর্ণাহুতি দিতে পারেন। তাঁহার জীবনই যথার্থভাবে ধন্য ও সার্থক! তাঁহার জীবন-যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের পরম পরিতৃপ্তি ঘটে! তাঁহারি জীবন-পুষ্পের বিমল সৌরভে দেবকুল, ঋষিকুল ও পিতৃকুল আনন্দিত হইয়া উঠেন!

যিনি জীবিতকালে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও তাহা বহু সৎকার্য্যে লাগাইয়া তাহার "অনর্থ" অপবাদটি ঘুচাইয়া দেন, এবং তাহাতেই তাহার কল্যাণ মূর্ত্তিটিকে ত্যাগের দ্বারা উজ্জ্বল করেন, ও পরিশেষে অক্ষুব্ধ চিত্তে উপরত হন, তিনি যথার্থ গৃহস্থ, তাঁহার গৃহধর্ম্মই সার্থক!

তিনিই সমস্ত মান ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া সবল কণ্ঠে বলিতে পারেন "যেনাহং নামৃত স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"। তিনিই যথার্থ ত্যাগী—যিনি সমস্ত আপদ্‌কে পরিচিত সহজ ভোগের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া, মরিবার প্রয়োজন হইলেও, অনায়াসে অকুণ্ঠিতচিত্তে মরিতে পারেন! তিনিই যথার্থ বীর—আদর্শ গৃহীই তিনি!

যিনি দিনের শেষে সন্ধ্যাবেলায় গভীর ভক্তি দ্বারা আপনার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবীকে অন্তরের সহিত বলিতে পারেন :—

"মাগো, আমি শুধু আমার জন্য নহি; আমি সকলের জন্য, শুধু আমার দীনতা ঘুচিলেচলিবে না, কেবল আমার পরিজনেরা ঐশ্বর্য্যের

মধ্যে বাড়িলেই চলিবে না; আজি যে যেখানে আছে, সকলের জন্যই তোমার কাছে ভিক্ষার অঞ্চল পাতিয়াছি! আজ যেখানে যে দীন, হীন, অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহাকে অন্ন দাও! যে বস্ত্রহীন, তাহাকে বস্ত্র দাও! যে ধর্ম্ম হইতে স্খলিত তাহাকে ধর্ম্মের পীযূষধারায় পরিতৃপ্ত কর! যে জ্ঞানহীন তাহার চিত্ত জ্ঞানালোকে পূর্ণ কর! যে আশ্রয়হীন, তাহাকে আশ্রয় দাও! যে অপমানিত ও ব্যথিত, তাহাকে সান্ত্বনা দাও! সমস্ত বিশ্বের ক্ষুধার্ত্ত উদর এবং সমস্ত বিশ্বের পিপাসিত চিত্ত, তোমার কৃপাদৃষ্টিতে ভরিয়া উঠুক! আমরা উচ্চ কণ্ঠে গাহিতে থাকি ঃ—

অম্ব! ত্বদীয়চরণাম্বুজ-সেবনেন,
ব্রহ্মাদয়োঽপ্যখিলজাং শ্রিয়মাশ্রয়ন্তে।
তস্মাদহং তব নতোঽস্মি পদারবিন্দে,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

সন্ধ্যাত্রয়ে সকলভূসুর-সেব্যমানে,
স্বাহা স্বধাসি পিতৃদেবগণার্ত্তিহন্ত্রী।
জায়া সুতঃ পরিজনোঽতিথয়োঽন্নকামাঃ,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

একাম্রমূলনিলয়স্য মহেশ্বরস্য
প্রাণেশ্বরি প্রণতভক্তজনায় শীঘ্রং।
কামাক্ষিরক্ষিত-জগত্ত্রিতয়েঽন্নপূর্ণে
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥

তৃতীয় অধ্যায়।

——:০:

গার্হস্থ্যব্রত।

"ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমা বসেৎ॥" মনু, ৩, ১২।

গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী ছত্রিশ বৎসর যাবৎ বেদত্রয়-অধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম-বিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কিংবা চতুর্থাংশ কাল, অথবা তিন বেদের যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, ততকাল গুরুগৃহে যাপন করিবেন; অথবা নিজ শাখাধ্যয়নের পর বেদের তিন শাখা, বেদের দুই শাখা কিংবা বেদের এক শাখা মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-ক্রমানুসারে অধ্যয়ন করিয়া অস্খলিত-ব্রহ্মচর্য্য-অবস্থায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবেন।

ইহার দ্বারাই বিবাহের বয়স কতকটা অনুমিত হয়। যদি পঞ্চ বর্ষে গুরুগৃহে বাসের প্রারম্ভ ধরা যায় এবং ৩৬ বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়, তবে ৫+৩৬=৪১ বৎসর বয়স, সেকালে বিবাহের বয়স ছিল। যাহারা এত দিন পাঠ করিতেন না, বা এত অল্প বয়সে গুরুগৃহে যাইতেন না, তাঁহাদের ৯+১৮=২৭ বৎসরও বিবাহের কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বর্ত্তমান কালেও

দারপরিগ্রহ।

১৬ বৎসর বয়সকে যদি প্রবেশিকাপরীক্ষার কাল ধরা যায়, তবে এম্. এ. পর্য্যন্ত পাঠ শেষ করিতে তাহার আরও ৬ বৎসর লাগিবে। কিন্তু সকল ছেলেই যে ১৬ বৎসরে প্রবেশিকা দিবে, বা আর ৬ বৎসরে এম্. এ পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারিবে, তাহা সম্ভব নহে; সুতরাং, ১৬+৮=২৪ বৎসরের পরে ২৫শে বৎসর বয়সে এখনকার বিবাহকাল ধরা যাইতে পারে। ইহার আগে কোন মতেই বিবাহ হওয়া উচিত নহে। আসল কথা অধ্যয়নসমাপনান্তেই বিবাহ দেওয়া সকল অভিভাবকের কর্ত্তব্য। ইহাতে যদি বালকের বয়স ৩০শ বৎসরও হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু ১৭।১৮।১৯।২০ বৎসরে বিবাহ দেওয়া নিতান্তই কুপ্রথা বলিতে হইবে।

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্॥"

"গুরুর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রতস্নান-সমাপনের পরে দ্বিজ ব্রহ্মচারী লক্ষণান্বিতা সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন।"

কন্যাগ্রহণ-সম্বন্ধে রক্তের দূরত্ব-রক্ষা।

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

যে স্ত্রীলোক মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি-বংশজাত নহেন ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহেন, এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হন, এমন স্ত্রীই বিবাহকর্ম্মে প্রশস্তা।

স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়াই প্রধানতঃ সংসারধর্ম্ম। সেই বিবাহের

প্রধান উদ্দেশ্য আবার পুত্রলাভ। সুতরাং সৎপুত্র-লাভে যেখানে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, সেরূপ স্ত্রী-পুরুষের মিলন তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। নিকটস্থ কুলে বিবাহ করিলে উক্ত দোষ আসিবার সম্ভাবনা। তজ্জন্যই তাঁহারা সগোত্রা ও সপিণ্ডার পাণিগ্রহণে এত নিষেধ করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, যে শ্রেণীতে লোকসংখ্যা কম, তাঁহাদের মধ্যে রক্তের নৈকট্যসম্বন্ধকে সব সময়ে মানিয়া চলা অসম্ভব হয়। কিন্তু সেই সকল বিবাহসম্বন্ধের ফল খুব ভাল হয় না। সেই সব স্থানে পুত্রসন্তান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কন্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং কোন কোন স্থানে বংশলোপও হইতে দেখা যায়। তা' ছাড়া এক গোষ্ঠীর বা নিকট সম্বন্ধের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে শারীরিক শক্তির, গুণের এবং গঠনের খুব তারতম্য হয় না। সুতরাং সেরূপ দম্পতি হইতে বংশের উৎকর্ষ সাধন হয় না। আরও এক কথা, কন্যা বা পুরুষের গোষ্ঠীর মধ্যে কোন রোগ থাকিলে, তাহা স্থায়ী ভাবে সঞ্চারিত হয়। কারণ তাহাকে বাধাদিবার উপযুক্ত রক্তের সম্পূর্ণ অভাব হয়। কিন্তু যাঁহারা বহুদূর হইতে আনীত, বা যে সব স্ত্রীপুরুষের বংশের সহিত অনেকদূর পর্য্যন্ত কোন রক্তের সম্পর্ক নাই, সে সব মিলনে বংশগত কোন রোগ বা চরিত্রগত ত্রুটির সংশোধন সাধিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। আমার মনে হয়, আজ কাল বঙ্গদেশে রাঢ়ীয়, বরেন্দ্র, বৈদিক ও ঔৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যদি সকল শ্রেণীর মধ্যে পুত্রকন্যার আদান প্রদান চালাইতে পারেন, তবে রক্তের বেশ দূরত্ব রক্ষিত হয়, এবং আমার বিশ্বাস, সবল পুত্রসন্তান-

লাভেরও হয়তো অনেকটা অধিক সম্ভাবনা থাকে। বৈদ্য ও কায়স্থ দিগের মধ্যেও এইরূপ প্রচলন হইলে মন্দ হয় না। অনেক সময়ে কৌলীন্যের খাতিরে খুব নিকটতম রক্তসম্বন্ধীয় আত্মীয়ের সহিত আদান-প্রদান চালাইতে বাধ্য হইতে হয়। তাহার ফলও খুব ভাল হয় বলিয়া মনে হয় না। তা ছাড়া নিকট বিবাহে নানারূপ কলহ বিবাদেরও সম্ভাবনা অধিক হয়। কারণ তাহারা পরস্পর পরস্পরের দোষগুণে পরিচিত।

কন্যার কুলনির্ব্বাচন-সম্বন্ধে নিয়ম।

কোন্ কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে এবং কোন্ কুল হইতে কন্যা গ্রহণ করিবে না, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর অভিমত লিখিত হইল। প্রথমতঃ কোন্ কুল হইতে কন্যা লইতে নিষেধ। তাহা দেখা যাক—

"মহান্ত্যপি সমৃদ্ধানি গোঽজাবিধনধান্যতঃ।
স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জয়েৎ॥
হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানিচ॥"

গো, ছাগ, মেষ ও ধন ধান্য দ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশকুল পরিত্যাগ করিবে। হীনক্রিয় অর্থাৎ যে বংশ যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মবর্জ্জিত, এবং যে বংশে কোন শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, ও চাল-চলন খুব আপত্তিজনক; নিষ্পুরুষ—যে কুলে পুরুষ জন্মে না, কন্যাই অধিক জন্মে (বুঝিতে হইবে, সে কুলে পুরুষ হীনবীর্য্য; সুতরাং স্ত্রীজিত ও পৌরুষ-

বিহীন; অতএব তাহাদিগের দ্বারা কোন শুভানুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনা নাই); নিশ্ছন্দ—অর্থাৎ যে কুলে বেদাধ্যয়ন রহিত হইয়া গিয়াছে, (সে হিসাবে আজকাল আমরা সকলেই অযোগ্য); রোমশ—অর্থাৎ সকলেই বহুলোমযুক্ত; এবং অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার, শ্বিত্র এবং কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, এই দশ কুলে বিবাহসম্বন্ধ রাখিবে না। বুঝিতেই পারা যাইতেছে, এই সকল রোগ যে বংশে আছে, তাহাদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ রাখিলে, সেই রোগবীজ কন্যাগ্রহণকারীদের বংশে সঞ্চারিত হইবে; প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষের মধ্যে রোগ প্রকাশ না পাইলেও, পরবর্ত্তী বংশেও সঞ্চারিত হইতে পারে; ইহার প্রমাণের অভাব নাই। তখন সে বংশের সহিত আদান-প্রদান রাখা বংশের পক্ষে শুভজনক নহে। কোন কুলে বিবাহ সম্বন্ধ রাখিবে, সে বিষয়ে মনুর অভিমত এই:—

"মন্ত্রতস্তু সমৃদ্ধানি কুলান্যল্পধনান্যপি।
কুলসঙ্খ্যাঞ্চ গচ্ছন্তি কর্ষন্তি চ মহদ্যশঃ॥" মনু, ৩, ৬৬।

যে কুল বেদদ্বারা সমৃদ্ধ অর্থাৎ যে কুলে বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান ও বেদবিহিত কর্ম্মের নিত্যই অনুষ্ঠান হইতে থাকে, সেই কুল অল্পধনশালী হইলেও, কুলগণনায় উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয় এবং মহা সুখ্যাতি লাভ করে।

নিম্নলিখিত অসদাচরণে উৎকৃষ্ট কুলও অপকৃষ্ট হইয়া যায়:—

উৎকৃষ্ট কুল কিরূপে অপকৃষ্ট হইয়া যায়।

"কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্ব্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ॥"

অযাজ্যযাজনৈশ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্ম্মণাম্।
কুলান্যাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ॥"

"কুবিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ালোপ, বেদশাস্ত্রের অধ্যয়নাভাব এবং ব্রাহ্মণের অনাদর এই সকল কারণে অতি শ্রেষ্ঠকুলও নিকৃষ্ট হইয়া যায়।" "অযাজ্যের যাজন শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মের প্রতি নাস্তিক্য বুদ্ধি এবং মন্ত্র অর্থাৎ বেদহীনতা দ্বারা কুল শীঘ্র অপকৃষ্ট হইয়া যায়।"

বিবাহের অযোগ্যা কন্যা

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।"
নালোমিকাং, নাতিলোমাং ন বাচাট্যং ন পিঙ্গলাম্॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥"

"যাহার মস্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চির রোগিণী, যাহার গাত্রে লোম নাই, অথবা অতিশয় লোমযুক্তা, যে অত্যন্ত বাচাল, অথবা যাহার চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্ব্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবাসূচক যে কন্যার নাম তাহাকে এবং অতি ভয়ানক নামযুক্তা কন্যাকেও বিবাহ করিবে না"।

বিবাহ গ্রাহ্যা কন্যা।

"অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীম্।
তনুলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ম্"॥

"যাহার কোন অঙ্গবিকৃতি নাই, যাহার নাম সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের ন্যায় যাহার গমন, যাহার লোম, কেশ ও দন্ত অনতিস্থূল এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিবে॥"

সৎপুত্র ও কন্যা জননে, এবং সন্তানের চরিত্র গঠনে এবং তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিধানে দেখা যায় জননীর শক্তিই অধিক ক্রিয়া করে—সেই জন্য স্ত্রী সম্বন্ধে এত বাছাবাছি সৎপুত্র উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয়। তা ছাড়া আমরা দেখিয়াছি বীজ খুব ভাল হইলেও যদি ক্ষেত্র ভাল না হয় তবে সেই সুবীজেও ভাল গাছ হয় না—বরং কুবীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে পড়িলে ক্ষেত্রের গুণে ভাল ফল ফলে। উভয় তুল্য হইলে তো কথাই নাই। সেই জন্যই গণ, বর্ণ, জন্মপত্রিকা মিলাইয়া বিবাহের ব্যবস্থা আমাদের দেশে চির প্রচলিত। কিন্তু বীজের উৎকর্ষ অপেক্ষা ক্ষেত্রের উৎকর্ষের আরও অধিক প্রয়োজন। আমরা আজকালও প্রত্যক্ষ করিতেছি যে পিতা হয়তো খুব ভাল লোক, বহু সদ্‌গুণশালী, সংযমী পুরুষ, ও সদাচারসম্পন্ন পণ্ডিত, কিন্তু মাতা ঠিক ইহার বিপরীত ; ফলে পুত্রকন্যা পিতা অপেক্ষা মাতারই অনুরূপ গুণশালী হইয়া উঠে। ইহার কারণই এই যে, বাল্য জীবনে যে সংস্কার পড়ে সেই সংস্কার অনুরূপই ভবিষ্যতে আমাদের চরিত্র বিকাশ হয় অন্ততঃ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার খুব প্রবল না হইলে এই বাল্য জীবনের সংস্কারকে মুছিয়া ফেলা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে—তাই বাল্যকালের শিক্ষা, বাল্যকালের সঙ্গ, বাল্যকালের অভ্যাস, আমাদের চির জীবনের সাথী হয় এবং সমস্ত জীবনকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ প্রভাব হইতে মুক্তি পাওয়া অনেকটা অসম্ভব বলিলেও চলে। আবার এই বাল্যজীবনটী মাতার স্নেহ-শীতল-ছায়ার মধ্যে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং এই সময়

জননীকে অনুকরণ করা যেমন শিশুর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক এমন আর কিছুই নয়। তাই জননীর চরিত্র সন্তানের চরিত্রের উপর বড় বেশী কার্য্য করে। মার স্বভাব বালকের চরিত্রে এতটা আধিপত্য করে, যে উত্তর কালে সহস্র নীতি-শিক্ষা, পিতার তাড়না ও শিক্ষকের পরামর্শ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। মা তাই সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রধান দিগ্‌দরশন-যন্ত্র। সুতরাং জননীর শক্তি যখন এতটা কাজ করে তখন পাণিগ্রহণে স্ত্রী-নির্ব্বাচনের খুব কড়াকড়ি ভাব থাকা মঙ্গলজনক বলিতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা।

এইজন্যই মনে হয় স্ত্রীজাতির শিক্ষা দীক্ষার প্রতি আমাদের কতটা দৃষ্টি থাকা আবশ্যক—অথচ এ বিষয়ে আমাদের মত উদাসীন বোধ হয় সভ্য জগতের মধ্যে আর কেহই নহে। যদিও আমাদের কতকগুলি সামাজিক অন্তরায় আছে, কিন্তু যাহা অন্যায় ও অকল্যাণকর তাহার প্রতিবিধানে সমাজকে বাধ্য করানো কি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের একান্ত কর্ত্তব্য নহে? "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—একথা তো আম্মাদেরই দেশের কথা। এ দেশে উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও নিতান্ত হীন নহে। যে দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ী, সীতা, সাবিত্রী, কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সুলভা, সুজাতা, সুপ্রিয়া, শ্রীমতী প্রভৃতি সর্ব্বজনপূজিতা ললনা-গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—সে দেশে স্ত্রীলোকেরা অশিক্ষিত থাকিত এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে? মধ্যযুগে এবং বর্ত্ত-

মান যুগেও স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট উচ্চ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে পুরুষদের শিক্ষার সঙ্গে তাঁহাদের শিক্ষার সর্ব্বত্রই যে একই মিল রাখিতে হইবে অথবা তাঁহাদিগকে স্কুল, কলেজে যাইতে হইবে তাহার কোন হেতু নাই। জীবনের যে চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা—ইহার জন্য যেটুকু লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন তাহা অবশ্যই তাঁহাদিগকে দিতে হইবে কিন্তু ভিন্ন উপায়ে। শুধু অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়াই তাঁহাদের জীবন ব্যয়িত না হয়—মনুষ্যত্ব-লাভে তাঁহাদের যে অংশ ও অধিকার আছে তাহা তাঁহারা যাহাতে গ্রহণ করিতে পারেন এবং জ্ঞানে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, ভক্তিতে যাহাতে যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন তাঁহাদিগকে এরূপ যোগ্যতা লাভের সুযোগ দেওয়া অবশ্যই কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের নিপুণা গৃহিণীদের যে অদ্ভুত গৃহিণীপনা ছিল—যাঁহারা জননী, ভগিনী ও গৃহিণীর হৃদয়ভরা আনন্দময়ী-মূর্ত্তির আদর্শরূপে গৃহকে উজ্জ্বল ও আনন্দিত করিয়া রাখিতেন—যাঁহাদের পুণ্য প্রভাব গৃহকে ও গৃহবাসীদিগকে সর্ব্বপ্রকার দীনতা হইতে রক্ষা করিত, যাঁহারা স্নেহে, প্রেমে, দয়ায় সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী ছিলেন—যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অপূর্ব্ব উদারতায় এই মর জগতে অমৃতের বন্যা ছুটিত তাঁহাদের সেই হৃদয়ের শিক্ষার সঙ্গে একটু মানসিক শিক্ষার যোগ থাকিলেই তাঁহারা মানবের জীবন-পথে সাক্ষাৎ গৃহদেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ।

আমরা আজকাল স্ত্রীলোকদিগকে দাসীর মত খাটাইয়া মারি—কিন্তু তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে জানি না ; কারণ আমরা ভীরু ও দুর্ব্বল। কিন্তু প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিবার প্রথা ছিল।

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

"পিতৃভির্ভ্রাতৃভি শ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈ স্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥
"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ "॥
"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥"
"জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যা হতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ" ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ" ॥

"স্ত্রীলোককে বহু মানপূর্ব্বক ভোজনাদি প্রদান ও ভূষণাদি দ্বারা সদাই ভূষিত করা বহু কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের কর্ত্তব্য। যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে দেবতারা তথায় প্রসন্ন আছেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারে যাগাদি ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদায়ই বৃথা হইয়া যায়। "যে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদাই দুঃখিতা থাকেন, সেই কুল আশু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যথায় স্ত্রীলোকের

কোন দুঃখ নাই, সেই পরিবারের সর্ব্বথা শ্রীবৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোক-গণ অসংস্কৃত থাকাতে যে গৃহে অভিসম্পাৎ করেন, সেই কুল অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়"! অতএব যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালে এবং উৎসবের সময় অশন, বসন ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীলোকের সমাদর করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য"।

বিবাহ ও তাহার প্রকার ভেদ।

পূর্ব্বকালে আট প্রকার বিবাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল, যথা, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। তন্মধ্যে প্রথম চারি প্রকার বিবাহই প্রশস্ত। আসুর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ কতকটা চলতি গোচের। কিন্তু রাক্ষস ও পৈশাচ রাক্ষস ও পিশাচেরই যোগ্য। আজকাল আমাদের দেশে নামে প্রাজাপত্য বিবাহ থাকিলেও অধিকাংশ স্থলে আসুর বিবাহেরই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

"জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম্ম উচ্যতে"॥

শাস্ত্রমতে নয় পরন্তু স্বেচ্ছামতে কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ তাহাকে আসুর বিবাহ বলে"।

আজকাল আমাদের দেশে অকুলীন ও বংশজ ব্রাহ্মণগণ (ইঁহাদের সংখ্যা অল্প নহে) এইরূপেই কন্যা আনয়ন করেন—অথচ আমরা মন্ত্রে প্রাজাপত্য বিবাহের অনুবর্ত্তন করি—ইহা মিথ্যাচার। ব্রাহ্মণের পক্ষে এ বিবাহ নিতান্তই অসিদ্ধ; এইরূপ বিবাহের ফলে যে সকল পুত্র কন্যা উৎপন্ন হয় তাহারা শ্রাদ্ধাদির অনধিকারী।

প্রধান চারি প্রকার বিবাহ।

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ" ॥
"যজ্ঞে তু বিতত সম্যগৃত্বিজে কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
অলঙ্কৃত্য সুতাদানং দৈবং ধর্ম্মং প্রচক্ষতে" ॥
"একং গো মিথুনং দ্বৌ'বা বরাদাদায় ধর্ম্মতঃ।
কন্যাপ্রদানং বিধিবদার্ষো ধর্ম্মঃ স উচ্যতে ॥"
"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্ম মিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ" ॥

"কন্যাকে সবিশেষ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া বিদ্যা ও সদাচারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া যে কন্যা দান—তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। জোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তার পুরোহিতকে অলঙ্কৃতা কন্যাদান—দৈববিবাহপদবাচ্য। যাগাদি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে গো বলীবর্দ্দ এক জোড়া বা দুই জোড়া গ্রহণ করিয়া যে বিধিবৎ কন্যাদান তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে। "তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ করিবে"—এই অনুরোধ করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক যে কন্যা দান তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে"।

আর্ষ ও দৈব বিবাহ আমাদের দেশে এখন আর প্রচলিত নাই।

বিবাহে যৌতুক।

তবে বর্ত্তমান কালের বিবাহ প্রণালীর ধরণ দেখিয়া মনে হয় ইহা ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহের সংমিশ্রণের ফল। কিন্তু দেশে পাত্রপক্ষ হইতে

কন্যাপক্ষীয়দিগের নিকট হইতে তাঁহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত অর্থকে আকর্ষণ করিবার যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহাকে আসুর বিবাহ না বলিয়া থাকিতে পারি না। কন্যা বিক্রয় করিলে যদি পাপ হয় পুত্রের বিবাহে বল পূর্ব্বক দেনা পাওনার প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দিয়া কন্যা-কর্ত্তাকে বিপদাপন্ন করিয়া তুলিলে তাহাকেই বা পুত্র বিক্রয় কেন বলিব না? অথচ সন্তানবিক্রয়ে কি মহাপাপ মনু বলিতেছেন দেখুন:—"গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্য বিক্রয়ী"—লোভ বশতঃ যে বিবাহে শুল্ক লয় সে অপত্যবিক্রয়ী"। গোহত্যা ও অপত্য বিক্রয় সমান পাতক। সুতরাং হিন্দুদের ধর্ম্মব্যবস্থানুসারে কন্যাকে যিনি যাহা দিতে পারিবেন বা বরকে যাহা দিবেন—তাহা তাঁহার সাধ্যমতই দিবেন এজন্য কন্যাকর্ত্তাকে বাধ্য করিয়া লওয়া অত্যন্ত কুপ্রথা, বর্ব্বরতা এবং অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কিন্তু হায় এ বিষয়ে আমাদের দেশে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের কিছুই দৃষ্টি নাই! একে রোগাতুর দেহ তায় অন্নহীন এ অবস্থায় কন্যাদানের পণ সংগ্রহ করিতে কন্যাকর্ত্তাকে যেরূপ বিড়ম্বিত হইতে হয়—তাহা দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে! সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই অথচ আমরা হরিসভা করি, রাজনৈতিক আন্দোলন করি, কায়স্থ বড় না বৈদ্য বড় বলিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই! ইহাই কি শিক্ষার সুফল!

শাস্ত্র বলিয়াছেন ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য বিবাহে যে যে সন্তান জন্মে তাঁহারা ব্রহ্মতেজযুক্ত হ'ন, তাঁহারা সুরূপ, সত্ত্বগুণপ্রধান, যশস্বী, ধার্ম্মিক, ও দীর্ঘায়ু হ'ন!

কুবিবাহের ফলই কুসন্তান।

অবশিষ্ট আর চারিটি বিবাহে ক্রূরকর্ম্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদবিদ্বেষী পুত্র সকল জন্ম গ্রহণ করে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের বর্ত্তমান বিবাহপ্রণালী যাহাই হউক কার্য্যে তাহা আসুর বিবাহের অনুরূপ সুতরাং তদুৎপন্ন আমাদের সন্তানগণ যে ক্রূরকর্ম্মা মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদবিদ্বেষী হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অথচ বিস্ময়ের বিষয় এই পুত্র অধার্ম্মিক হইলে তাহাকে তখন গালি পাড়ি, ও আপন আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই—কিন্তু ধনে প্রাণে মরিয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে যে লোক কন্যাদান করে তাঁহার তপ্ত অশ্রু ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস—ও এই আসুর বিবাহের ফলস্বরূপই কি ঐ সকল সন্তানাদি অধার্ম্মিক, ক্রূরকর্ম্মা, নাস্তিক ও মূঢ়বুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে না?

সন্তানোৎপাদনের শাস্ত্রসম্মত বিধি।

সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধেও আর আমরা নিয়ম মানিয়া চলি না; তাহাও আমাদের একটি দুর্ভাগ্যের কারণ। নিয়মের বলেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হন। যাহারা নিয়ম মানিতে পারে না যাহারা উচ্ছৃঙ্খল—তাহারাই তো হীনবীর্য্য শূদ্র, অনার্য্য ও কাপুরুষ। সন্তানোৎপাদনের জন্য স্ত্রীপুরুষের যে সঙ্গম তাহাতেও শাস্ত্র বিধি উল্লঙ্ঘন না করিলে আশা করি এখনও অনেক সুফল ফলে। মনুর বিধান এই:—

"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥

"তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্ত নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্ত প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥
"নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচর্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্" ॥

"শিষ্টনিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া স্ত্রীলোকের ঋতুকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ষোড়শ অহোরাত্র জানিবে। তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি এই ছয় রাত্রি স্ত্রী গমনে নিষিদ্ধ; অবশিষ্ট দশরাত্রি প্রশস্ত। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি ও অনিন্দিত দশ রাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্ট রাত্রি অর্থাৎ এই চতুর্দ্দশ রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্ব্ববর্জ্জিত দুই রাত্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন—তিনি ব্রহ্মচারীই থাকেন—তাঁহার ব্রহ্মচার্য্যের কোন হানি হয় না।"

শাস্ত্রের বিধান এই যে গৃহী বিবাহলব্ধ অগ্নিতে যথাবিধি গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন, পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও প্রাত্যহিকী পাকক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। গৃহস্থালী করিতে গেলেই কতকগুলি অনিবার্য্য পাপানুষ্ঠানে আমাদিগকে রত হইতে হয়। বোধ হয় মনুষ্যজীবন ধারণ করিতে গেলে তাহা অনুষ্ঠিত না হইয়া উপায় নাই। চলিতে গেলেই পদক্ষেপে কীট পতঙ্গাদি মরিয়া যায়, প্রতিদিন মুখগহ্বরে কত কীটাণুকে আমরা ধ্বংস করিতেছি, সম্মার্জ্জনী দ্বারা গৃহাদি পরিমার্জ্জিত করিবার সময়েও আমরা কত প্রাণীকে নষ্ট করি—সুতরাং এ সকল কারণে

পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

অবশ্যই আমাদের পাপ ঘটে কিন্তু তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি? তজ্জন্যই ঋষিরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

'অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

'অধ্যয়ন অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দৈবযজ্ঞ, পশু পক্ষী ও কীটাদিকে অন্নাদি প্রদান রূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ'।

'দেবতাতিথি ভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানা মুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি॥

'দেবতা, অতিথি, ভরণীয় পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আত্মা—এই পাঁচ জনকে যে ব্যক্তি উক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিশ্বাস প্রশ্বাস বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে'।

তা ছাড়া আমরা জগতে আসিয়া ৫টী মহাঋণে আবদ্ধ হই। সেই পঞ্চঋণ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়ও এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ। আমরা জগতে আসিয়া যে সকল উপকরণ, সুখ, আরাম বা জ্ঞান লাভ করি—তাহা কিছু আমার একার পরিশ্রমের ফল নহে। আমার জ্ঞান লাভের জন্য যুগযুগান্তর হইতে আয়োজন চলিতেছে—কত মহানুভবগণ কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া কত পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানানুসন্ধানে তাঁহাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং অদ্যাবধিও করিতেছেন—কত লোক কত সুদুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা তাহার ফলভোগ করিতেছি। আমরা অন্ন দ্বারা জীবন

ধারণ করিব বলিয়া কত লোক কত পরিশ্রমই করিতেছে—আমাদের সুখের জন্য, সৌভাগ্যের জন্য, ভূমি কর্ষণ, শস্যোৎপাদন, খনিজ পদার্থের বহিষ্করণ ইত্যাদি শিল্প বাণিজ্যের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের সুখের জন্য পশুরা পর্য্যন্ত খাটিয়া মরিতেছে, বৃক্ষলতা ফলপুষ্পে ভূষিত হইয়া আমাদের সেবার আয়োজন করিতেছে কীটাদি পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাণদান করিয়া আমাদের সুখলাভে সাহায্য করিতেছে—সমস্ত জীবই আমাদের জন্য খাটিয়া সারা—এ ঋণ আমরা কেমন করিয়া পরিশোধ করিব? শুধু কি তাই? দেবতারা পর্য্যন্ত আমাদের জন্য কত শ্রম করিতেছেন। ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতেছেন, সূর্য্য আলোক ও জীবন, চন্দ্র সুশীতল কিরণ ও অমৃত, পবন বায়ু, বরুণ জল, ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে দেবগণ আমাদের সুখশান্তিবিধানে সতত সচেষ্ট আছেন—তাঁহাদের প্রতিও তো একটা কৃতজ্ঞতা আছে। এই সকল ঋণ পরিশোধের উপায় কি? ঋষিরা তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনার দ্বারা ঋষিঋণ, হোম, দৈবযজ্ঞ, পূজার্চ্চনাদি দ্বারা দেবঋণ, শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃঋণ অন্নদান ও অতিথি সেবা দ্বারা মনুষ্যঋণ, এবং জীব জন্তুকে অন্নাদি দানের দ্বারা ভূতঋণ হইতে আমরা মুক্তি পাইব। ইহাতে দয়াধর্ম্মও অক্ষুণ্ণ থাকে। হিন্দুরা দয়াকেই প্রধান ধর্ম্মসাধন বলিয়াছেন—"কঃ ধর্ম্ম ভূতে দয়া।"

এই সকল এবং অন্যান্য দৈব যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতারা সম্বর্দ্ধিত

যজ্ঞ।

হন। এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া মানবগণের শ্রেয়ঃ বিধান করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ নিয়ম পূর্ব্বক এই

সকল যজ্ঞ আর আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত হয় না। দুঃখ, দারিদ্র্য রোগও সেই জন্য আমাদিগকে ঘেরিয়া বসিয়া আছে! গীতায় আছে—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ"॥

"এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে"।

আধ্যাত্মিক যজ্ঞ।

মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে আছে যে কোন কোন বাহ্যাভ্যন্তর-যজ্ঞানুষ্ঠান-শাস্ত্রজ্ঞ বাহ্য চেষ্টা হইতে উপরত হইয়া বিষয় হইতে সর্ব্বদা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার দ্বারাই এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। কোন কোন জ্ঞানী গৃহস্থ বাক্য এবং প্রাণবায়ুতে যজ্ঞ নিষ্পাদনের অক্ষয় ফল জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যে প্রাণবায়ু এবং প্রাণবায়ুতে বাক্য আহুতি প্রদান করেন। অপর কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমুদয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহারা উপনিষদ চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছেন যে জ্ঞানই সমুদয় যজ্ঞের মূল কারণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন:—

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।
"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথা পরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্॥"

গীতা ৪র্থ অঃ

মনু বলিয়াছেন দ্বিজগণ প্রতিদিন অগ্নিতে বৈশ্বদেবোদ্দেশে পক্ক অন্ন দ্বারা বিধিপূর্ব্বক দেবগণের হোম করিবেন।

হোম। উক্ত প্রকারে অনন্যমনা হইয়া প্রতি দেবতাকে হবির্দ্বারা হোম করিয়া পূর্ব্বাদি দিগক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ, সোম—ইহাঁদিগকে ও ইহাঁদের অনুচর দেবতাদিগকে বলি প্রদান করিবে। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে সূর্য্যদেবে তাহা উপস্থিত হয়। সূর্য্য হইতে সেই রস বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। পূর্ণিমা অমাবস্যাদি প্রতি পর্ব্বদিনে সাবিত্রি ও শান্তি হোম করিবে"।

আজ কাল বিজ্ঞানের কাল, যজ্ঞীয় ধূম হইতে বাষ্প হয় এবং সেই বাষ্প হইতে জল হয় শুনিয়া বিজ্ঞানবিদেরা হাসিয়া আকুল হইবেন। অবশ্য অযৌক্তিক কথা কেহ বিশ্বাস যদি না করেন

তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ বিজ্ঞানবিদেরা অনায়াসে একথা বলিতে পারেন যে অনেক দেশ আছে যেখানে যজ্ঞ মোটেই হয় না অথচ তথায় বৃষ্টি হইতেছে এবং শস্যাদিও জন্মিতেছে সুতরাং "যজ্ঞাৎ ভবতি পর্জ্জন্যঃ" এই গীতোক্ত বাক্যের সার্থকতা কোথায়? প্রথমতঃ "পর্জ্জন্য" সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মত কি দেখা যাক। তাঁহারা বলেন মার্ত্তণ্ড কিরণে পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে; তখন বায়ু অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য লাভ করে। জলের অণু সকলেরও একটি আভ্যন্তরিক শক্তি আছে যেহেতু উহা বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিলিত হইতে চাহে, এই দুই শক্তির সংযোগে জল হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুতে মিলিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিজ্ঞান মতে বৃষ্টির কারণ জল, তাপ ও বায়ু। কিন্তু ঋষিগণ "যজ্ঞ"কেই বৃষ্টির কারণ বলেন। এ কথাটি উপরে উপরে না বুঝিয়া একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। জড়ের মধ্যে যে কাজ হয় ঋষিরা তাহাকে জড়ের শক্তি বলেন না—তাহার মধ্যে তাঁহারা একটি চেতন শক্তিকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এইজন্য প্রত্যেক মন্ত্রের ঋষি দেবতা ও ছন্দ তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন। ঋষি তাঁহারাই—যাঁহারা সেই শক্তিকে অনুভব করেন। সেই শক্তিই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শুধু ঋষি, দেবতা ও ছন্দ জানিলেই হইবে না—"বিনিয়োগ"ও জানিতে হইবে। অর্থাৎ কি কাজের জন্য উহাকে লাগাইতে হইবে তাহাও জানা আবশ্যক। ছন্দও সেইজন্য প্রয়োজন অর্থাৎ কেমন করিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে

হইবে। এই সকল জানিলে তবে মন্ত্র চৈতন্য হয় এবং কার্য্যও সিদ্ধ হয়। ঋষিরা হস্তের শক্তিতে ইন্দ্রদেবকে, চক্ষের শক্তিতে সূর্য্যদেবকে, মনের মধ্যে চন্দ্রমাকে, শক্তিশ্বররূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সকল কাজেই দেবতাদিগের হস্ত দেখিতে পাইতেন। আজকাল আর আমরা দেবতা বিশ্বাস করি না! আমাদের এতই অভিমান! এই যজ্ঞ সম্বন্ধে বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম এ. বি. এল মহাশয় যেরূপ বুঝাইয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কেহ যদি বুঝে অন্ন প্রস্তুত হইবার কারণ অগ্নি, জল, হাঁড়ি ও চাল আর একজন যদি বুঝিয়া থাকেন অন্ন প্রস্তুত হইবার কারণ কোন ব্যক্তির ক্ষুধা শান্তির উদ্দেশে; দুই জনেরই বুঝা ঠিক কিন্তু শেষোক্তের বুঝা অধিকতর ঠিক। তদ্রূপ বৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদিগের মত আংশিক সত্য হইলেও ঋষিরা যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই পূর্ণ সত্য। পাশ্চাত্য মতের অসম্পূর্ণতা এই যে পৃথিবী, জল, বায়ু, সূর্য্য সকল বৎসরেই সমান, তথাপি এক বৎসর বৃষ্টি হয় আর কেন এক বৎসর অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ? ইহা কি কেবল আকস্মিক ঘটনা? ভাত সিদ্ধ হইতেছে যদি কেহ দেখিবার লোক না থাকে, তবে অন্ন নষ্ট হইয়া থাকে; তজ্জন্যই পাকক্রিয়াভিজ্ঞ কোন পরিদর্শকের প্রয়োজন। পাকক্রিয়ার যেমন একজন চেতনকর্ত্তা থাকে সেইরূপ বর্ষণ ক্রিয়ারও একজন চেতনকর্ত্তা আছেন। চিন্ময়ী প্রকৃতির যে সন্তানগণ তাঁহার বৃষ্টি বর্ষণ ক্রিয়ার পরিদর্শক ঋষিগণ তাঁহাদিগকে বর্ষণকারী দেবতা

বলেন। সূর্য্যের তাপ, জল, বায়ু বৃষ্টির কারণ বটে, কিন্তু কেবলই কি তাহাই? বৃষ্টিপাতের চেতন কারণ আছে। ইহা যদি স্বীকার না করা যায় তবে এই যে কোন বৎসর সুবৃষ্টি, কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হইতেছে—ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই যে দেশকাল অনুসারে বর্ষণের তারতম্য যাহার উপর সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীর সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া থাকে ইহা কি কোন নিয়মের অধীন নহে? ঋষিরা বলেন, দেবতাগণ সেই নিয়মাভিজ্ঞ জীব। যে দেবগণ বৃষ্টিবর্ষণ সংক্রান্ত নিয়মাভিজ্ঞ, প্রকৃতির আদেশে বর্ষণ ক্রিয়া পরিদর্শনের ভার তাঁহাদিগের উপর ন্যস্ত আছে। ইঁহারা বর্ষণ ক্রিয়ার কর্ত্তা। মনুষ্যরাও যেমন দেহধারী জীব, দেবতারাও সেইরূপ দেহধারী জীব; তবে ইঁহাদের দেহ সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। মনুষ্যদিগের সহিত দেবতাদিগের এক প্রাকৃতিক সম্বন্ধ আছে—ইহারই নাম যজ্ঞ চক্র। মনুষ্য মন্ত্রপূত করিয়া তাঁহাদের অঙ্গনিঃসৃত তেজ দেবোদ্দেশে ত্যাগ করেন দেবগণ তাঁহাদের তেজ বৃষ্টিসহ মিলিত করিয়া বর্ষণ করেন। দেবগণ নিঃসৃত তেজ পৃথিবীস্থ অন্নের বীজ সকল অঙ্কুরিত করে। মনুষ্যগণ যখন আবার মন্ত্রপূত হবিঃ দেবোদ্দেশে আহুতি দেন, তখন সেই মন্ত্রময় তেজ অগ্নিগর্ভে পতিত হইয়া সূক্ষ্ম আগ্নেয় পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া দেবভোগ্য পদার্থে পরিণত হয় ও উর্দ্ধগামী হইয়া দেবলোকে গিয়া দেবতাদের পোষণ করিয়া থাকে"। এই দেবপূজার অপর নামই যজ্ঞ। এই যজ্ঞে দেবতা ও মানব পরস্পরে সংবর্দ্ধিত হইবেন—এই কথা ভগবান গীতায় বলিয়াছেন। এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া আমরা

যদি যজ্ঞ করিতাম, তাহা হইলে দেশে হয়তো এত দুর্ভিক্ষ এত রোগ এত দৈন্য আসিতে পারিত না। আমরা যে পুণ্য কর্ম্ম প্রচুর করিতে পারি না—তাহা তো আমরা প্রত্যক্ষই করিতেছি। কারণ আমরা দুর্ব্বল ও অনাচারী। সুতরাং তাহার ফলভোগও যথেষ্ট পরিমাণে করিতেছি। অনেকে বলিবেন ইংরাজেরা তো যজ্ঞ করে না কিন্তু তাহাদের শরীর তো বেশ সবল, তাহারা সুখী, দীর্ঘায়ুঃ—তবে দেবতারা বুঝি কেবল আমাদের ফলদানের জন্যই বসিয়া আছেন! না তাহা নহে। যদি ইংরাজেরা যজ্ঞহীন যথার্থই হন তবে তাঁহারা সুখী নন। কখনই ন'ন। সুখী হইতে পারেন না। যদি দেখা যায় তাঁহারা যথার্থই সুখী—তবে অবশ্যই তাঁহারা যজ্ঞ করেন—অন্ততঃ অবিধি পূর্ব্বকও করেন। তাহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি না? দেবোদ্দেশে ত্যাগের নামই কর্ম্ম বা যজ্ঞ। ইহা গীতার অভিমত। এই ত্যাগরূপ যজ্ঞ ইয়ুরোপীয়েরা প্রচুর করিয়া থাকেন। পরের মঙ্গলের জন্য অনেক ঋষি তুল্য ইয়ুরোপীয় ব্যক্তি—এমন কি অনেক ত্যাগশীল ধনকুবেরও এই মহাযজ্ঞ প্রতিনিয়ত সম্পন্ন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের অবিদিত হইলেও দেবতারা সেই সকল ভক্ত কর্ম্মবীরের প্রতি করুণা বর্ষণ করিয়া থাকেন। আর আমাদের দেশে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই যথার্থ ধর্ম্মকে উদ্দেশ্য করিয়া ত্যাগ করিতে আর চাহেন না। কুচর্চ্চা, কুচিন্তা, কুবাসনা, কুকর্ম্ম, অত্যাচার, ব্যভিচার, অধর্ম্ম আমাদের গ্রাস করিতে উদ্যত। কাজে কাজেই ঐ সকল কর্ম্মে দেবতারা সংবর্দ্ধিত না হইয়া আমাদের দেশে দানব শক্তিই দিন

দিন প্রশ্রয় পাইতেছে—আমরাও সরলভাবে নিশ্চিন্ত চিত্তে উৎসন্নের পথে অগ্রসর হইতেছি!

শ্রাদ্ধ। "কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥"

মনু, ৩য় অঃ।

"অন্নাদি দ্বারা, জল দ্বারা অথবা দুগ্ধ ও ফল মূলাদি দ্বারাই হউক, পিতৃগণের প্রীতি উদ্দেশে প্রতিদিন যথাসম্ভব শ্রাদ্ধ করিবে।"

শ্রাদ্ধের স্থান। "শুচিং দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলেপয়েৎ।
দক্ষিণাপ্রবণঞ্চৈব প্রযত্নেনোপপাদয়েৎ॥

৩য় অঃ মনু।

'শ্রাদ্ধ কার্য্যের জন্য শুচি ও নির্জ্জন প্রদেশ স্থির করিয়া তাহা গোময়ের দ্বারা উপলিপ্ত করিবে। সেই স্থানটি যদি স্বভাবতঃ দক্ষিণ দিকে ক্রমাবনত না হয়, তবে যত্ন সহকারে তাহাকে দক্ষিণাবনত করিবে।'

পিতৃকার্য্যের অগ্রেই বিশ্বদেব আবাহনাদি দেবকার্য্য সকল করা কর্ত্তব্য, কারণ ইহাতে পিতৃকার্য্য বিঘ্নহীন হয়। উক্ত দৈবকার্য্য না করিয়া পিতৃকার্য্য করিলে রাক্ষসেরা উহা নষ্ট করে—ইহা মহর্ষি মনুর অভিপ্রায়। মাসে মাসে শ্রাদ্ধ করাই বিধি তাহা যাঁহারা না পারিবেন তাঁহারা হেমন্ত, বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে তিনবার শ্রাদ্ধ করিবেন—কিন্তু পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত শ্রাদ্ধকার্য্য প্রতিদিন করিবেন। অন্ততঃ প্রতিদিন পিতৃতর্পণ করা কর্ত্তব্য।

শ্রাদ্ধ কর্ম্মের এই কয়েকটি প্রধান অঙ্গ :—অপরাহ্ণকাল, কুশ, উত্তমরূপে গৃহাদি মার্জ্জন, তিল, অন্নাদি শুদ্ধি, অক্মতরে ব্রাহ্মণদিগকে অন্নাদি দান এবং পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণলাভ।

শ্রাদ্ধ কর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।

শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে শুদ্ধ বেদজ্ঞানবিৎ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। শ্রাদ্ধে সদ্‌ব্রাহ্মণ পাওয়া না গেলে বরং ভোজন করাইবে না—তথাপি বেদজ্ঞানহীন, অপণ্ডিত, কদাচারী, দুষ্কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে না। এ বিষয় মনুর ৩য় অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মোটামুটি কতকগুলি মাত্র তাঁর উপদেশ এখানে উল্লেখ করিব :—বণিক্‌বৃত্তিজীবী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, শূদ্রযাজী, পাপকর্ম্মরত, মদ্যপায়ী, পাপরোগী, বেদনিন্দক, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহী, যাচ্ঞা দ্বারা যে অপরের বিরক্তি জন্মায়, শ্রৌত-স্মার্ত্ত-অগ্নিপরিত্যাগকারী, কুসীদজীবী, মাংসবিক্রয়ী, বেদাধ্যয়ন-বর্জ্জিত, দ্যূতক্রীড়ক ও পরভৃত্য যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধাদিতে বর্জ্জন করিবে।

ব্রাহ্মণ ভোজন।

যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইবার যোগ্য তাহাও মনু উল্লেখ করিয়াছেন। "সমুদয় বেদে যাঁহারা অগ্রগণ্য, সমুদায় বেদাঙ্গেও যাঁহারা সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যাঁহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণই পংক্তিপাবন বলিয়া জানিবে।" "বেদার্থবেত্তা, বেদার্থের প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, বহুদানশীল, শত বর্ষায়ুষ্ক ব্রাহ্মণ ইঁহারাও পংক্তিপাবন"। এই

সকল ব্রাহ্মণ যে অধিক পাওয়া যাইবে তাহা নয় সেই জন্য মনু তিনটি মাত্র উক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিতে বলিয়াছেন। এখন তো বহু চেষ্টাতেও সেরূপ একজন ব্রাহ্মণ পাওয়াও দুর্ল্লভ। সুতরাং সদ্‌ব্রাহ্মণ অভাবে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদিও সুতরাং লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং তজ্জন্যই পিতৃগণের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আমরা দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। হায় পংক্তিপাবন জগন্মান্য, সদাচারসম্পন্ন, বেদবিৎ, তেজস্বী, সত্যপ্রিয় ও সত্যবাক্ ব্রাহ্মণগণের কি আর অভ্যুদয় হইবে না?

শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রণকারী উভয়েরই সংযম

"ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে নিমন্ত্রণের দিন হইতে শ্রাদ্ধাহোরাত্র যাবৎ স্ত্রীনিবৃত্তি, যথানিয়ম অনুষ্ঠানবান্ হইবেন এবং জপাদি সন্ধ্যোপাসনা ব্যতীত বেদ অধ্যয়ন করিবেন না। যিনি শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাঁহাকেও এই নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে"। ব্রাহ্মণভোজনকালে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় আলাপ পিতৃগণের অভীপ্সিত। সেই জন্য এখনও আমাদের দেশে শ্রাদ্ধের পর মহাভারত, গীতা, পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণভোজনে, ভোজনকারী ব্রাহ্মণ দিগের সম্বন্ধে এতটা সাবধানতা অবলম্বন করা কেন উচিত তাহা মনু বলিয়াছেন। "পিতৃগণ ক্রোধশূন্য, শৌচপরায়ণ এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মচারী ভাবে অবস্থিত, তাঁহারা শস্ত্রত্যাগী, ঔদার্য্যাদি গুণযুক্ত, মহাত্মা এবং তাঁহারা দেবতাদিগেরও পুরাতন; তাঁহাদিগের উপাসনা করিতে গেলে তদ্ধর্ম্মী হওয়া

আবশ্যক। নিমন্ত্রিতব্রাহ্মণশরীরে পিতৃগণ অদৃশ্যরূপে অনুপ্রবেশ করেন; তাঁহারা যথায় গমন করেন, বায়ুপ্রমাণ পিতৃগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন, সুতরাং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা যদি নিয়মবান না হ'ন তবে তাঁহাদের শরীরে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না; সুতরাং শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়।

শ্রাদ্ধ শেষে প্রার্থনা

ব্রাহ্মণভোজনাবসানে ব্রাহ্মণ দিগকে বিদায় করিয়া শ্রাদ্ধকারী শুচিভাবে মৌনাবলম্বী হইয়া একাগ্রচিত্তে পিতৃলোকের নিকট এই সকল প্রার্থনা করিবেন :—

"দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেবচ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্তিতি"॥

'হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যাগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বেদ শাস্ত্রের যেন সম্যক আলোচনা হয়; আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশ পরম্পরা যেন চির কাল বিস্তৃত থাকে; বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদিগের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদ্ভাব না থাকে'।

'শ্রাদ্ধকার্য্য ও প্রার্থনা শেষ করিয়া পিণ্ডগুলিকে গাভী, ব্রাহ্মণ অথবা ছাগের দ্বারা ভোজন করাইবে কিম্বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।'

এমন একদিন ছিল যখন দেবার্চ্চনা না করিয়া কোন সদ্‌ব্রাহ্মণই

দেবতার অর্চ্চনা, অতিথিসৎকার ও ভৃত্যবর্গের ভোজন সমাপনান্তে গৃহকর্ত্তার যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন।

জলগ্রহণ করিতেন না। পাঁচশতবর্ষ আগে যখন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চ্চায় উন্মত্ত, যখন ভগবদ্প্রেমের কোন স্ফুরণই তাঁহার মধ্যে ছিল না, যখন বৈষ্ণবগণ তাঁহার কুতর্ক ও ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে অস্থির, তখনও তিনি প্রত্যহ দেবার্চ্চনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। চৈতন্যভাগবতে আছে 'বিষ্ণু পূজা করি তুলসীরে জল দিয়া, ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া'। তাঁহার পড়ুয়াদের মধ্যে যাহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি ও দেবার্চ্চনা করিয়া না আসিত তাহাদিগকে তিনি অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা করিতেন। কিন্তু সে দিন আর নাই! সকালে সকালে আফিসে যাইতে হইবে; দেব সেবা মাথায় রহিল—বাবু আটটার সময় নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া আফিসে বাহির হইয়া গেলেন। মূর্খ, কদাচারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের হস্তে দেবার্চ্চনার ভার দিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত। বৃদ্ধা গৃহিনীরা যত দিন ছিলেন তবু তাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, যাহাতে দেবসেবার কোন বিশৃঙ্খলা না ঘটে সে বিষয়ে তাঁহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল! এখনকার মেয়েদের তো সে পাট উঠিয়া গিয়াছে। দেবসেবা এখন মস্ত একটা আপদের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। উঠাইয়া দিতে পারিলেই সকলের হাড় জুড়ায়। বাস্তবিক যেরূপ অশ্রদ্ধার সহিত দেবপূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা উঠিয়া যাওয়াই মঙ্গল! আমাদের আফিসের ও চাকরীর জয় হ'ক! ধর্ম্ম থাক বা যাক তাহাতে ক্ষতি নাই! অতিথি সেবার আগ্রহও সেইরূপ! বাবু যাহা পান তাহার অনেকাংশ ছেলে

মেয়ের, পরিবারের রোগের ঔষধ পথ্যের জন্যই ব্যয়িত হয়—তার উপর, কন্যাদায়, পুত্রের শিক্ষার জন্য ব্যয়, গৃহিণীর অলঙ্কার, এবং বাবুর বিলাস বেশ ভূষার জন্য যায়—অতিথি সেবা হইবে কিসে? বৃদ্ধ পিতা মাতা থাকিলে তাঁহাদেরই সেবা হওয়া দুর্ঘট! হায় রে শিক্ষা! আগে একটি অতিথি আসিলে গৃহস্থ আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন এখন কেহ আগন্তুক আসিলে গৃহিণীরা তো আমল দিতেই চান না—বাবুদের মুখও পাংশুবর্ণ হইয়া যায়।

অনেকে বলিবেন সে কালে লোকের খরচ পত্র ছিল না; প্রচুর ধান হইত—তা থেকে দু মুটো অন্ন দেওয়া তখনকার লোকের পক্ষে তত কষ্টকর ছিল না—এখন ধান্য যে দুর্মূল্য! সবই সত্য কিন্তু তবুও ইহারি মধ্যে এখনও অতিথি সেবা চলে, এখনও পরের জন্য কিছু ব্যয় করা অসম্ভব হয় না—কিন্তু অন্য দিকে আমাদিগকে কিছু কমাইতে হয়; জামা, জুতা, কাপড়, ছাতা, বোতাম, ছড়ি, ঘড়ি, চুরুট, চেন ও গন্ধ দ্রব্যের ব্যয়কে লাঘব করিতে হয় এবং অন্তঃপুরেরও বেশ ভূষা অলঙ্কারের ব্যয়কে কিছু লঘু করিয়া আনিতে হয়। নচেৎ এ দারিদ্র ঘুচাইতে কমলারও সাধ্য নাই!

ভৃত্যবর্গের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষীয়েরা চিরপ্রসিদ্ধ। বৈদেশিকগণও এবিষয়ে শতমুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। তখন ভৃত্য প্রভুর জন্য প্রাণ দিত। কিন্তু এখন সে প্রভুপরায়ণ বিশ্বাসী ভৃত্য ও উদার স্নেহময় প্রভু উভয়ের অস্তিত্বই যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে! তখনকার এমন নিয়ম ছিল যে প্রভু

ও প্রভু পত্নী ভৃত্যদিগকে পর্য্যন্ত ভোজন করাইয়া তবে তাঁহারা ভোজন করিতেন। মনুর বাক্য এই :—

"ভুক্তবৎস্বপি বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈব হি।

ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী॥

"দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৃন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।

পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ॥ তৃয় অধ্যায়।

'ব্রাহ্মণগণকে, জ্ঞাতি, দাসাদি ভরণীয়বর্গকে ভোজন করাইয়া, পশ্চাৎ যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ দম্পতী তাহা ভোজন করিবেন। দেবলোক, ঋষিলোক, মনুষ্যলোক, পিতৃলোক ও গৃহদেবতা সকলকে অন্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া গৃহস্থকে তদনন্তর শেষভোজন করিতে হয়'।

'অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ।

যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে"॥

'যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের জন্যই অন্ন পাক করে সে কেবল পাপ ভোজন করে। যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই সাধুদিগের ভোজনের জন্য বিহিত হইয়াছে'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও এই উপদেশ গীতায় দিয়াছেন

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।

ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"॥

পশুপালন ও গো সেবা।

গৃহস্থের পক্ষে পশুপালন একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ গাভী ও বৃষের রক্ষণ পালন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, এবং ইহা পরম ধর্ম্ম। গাভীকে শ্রদ্ধার

সহিত যত্ন করা গৃহস্থ মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। গাভী আমাদের জননীর ন্যায় সাক্ষাৎ কল্যাণরূপিণী! শ্রাদ্ধাদির জন্য হবিঃ এবং অতিথি, দেবতা ও আত্ম সেবার জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্যের উপকরণ সকল গাভী হইতে আমরা পাইয়া থাকি—এই গাভী কুলকে যাহারা রক্ষণ ও পালন না করে, পরম অধর্ম্ম তাহাদিগকে আসিয়া আশ্রয় করে। গাভী ও বৃষের অবনতিতে আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যের এত অবনতি ঘটিয়াছে! গোচর ভূমি সকল এখন ক্রমশই লোপ পাইতেছে সুতরাং তাহারা আহার ও জলাভাবে দিন দিন কৃশ ও মলিন হইয়া যাইতেছে। আর সেরূপ দুগ্ধবতী গাভী ও ককুদ্‌মান বৃহৎ বৃষ সকল দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালের মত সেরূপ গোসেবা দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে; ইহা অবশ্যই অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

জীবিকার্জ্জনের জন্য মনু নিম্নলিখিত নিয়ম সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উপজীবিকা।

"যাত্রা মাত্র প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ম্" ॥

৪র্থ অঃ।

'প্রাণ যাত্রা মাত্র চলিয়া যায়—এই লক্ষ্য রাখিয়া শরীরকে কোন ক্লেশ না দিয়া, স্বকীয় বর্ণবিহিত অনিন্দিত কার্য্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিবে'।

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যাং বাপি ন শ্ব বৃত্ত্যা কদাচন" ॥

'ঋত (উঞ্ছবৃত্তি) এবং অমৃতের (অযাচিত ভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয়) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে অথবা মৃত (ভিক্ষাবৃত্তি) বা প্রমৃতের (কৃষিজীবন) দ্বারা কিম্বা সত্যানৃত (বাণিজ্য) দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার; পরন্তু জীবিকার জন্য কদাচ শ্ব বৃত্তি অবলম্বন করিবে না'। "সেবা শ্ববৃত্তি রাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ 'জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সেবা বা চাকুরি যাহা কুক্কুর বৃত্তি তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন করিবে'। ব্রাহ্মণেরা যে দিন হইতে এই কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহারা আপনাদের আত্মসম্মান ও সৌভাগ্য হারাইয়াছেন! সেই দিন হইতে তাঁহারা তপস্যা ও সংযম বিহীন, ব্রহ্মচর্য্যও সেই দিন হইতে অন্তর্হিত; এবং ভোগে ও বিলাসে স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত! এখন বিষহীন সর্পের ন্যায় শুধু তর্জ্জন করিয়া বেড়াইলে কি হইবে!

> "ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেঁতোঃ কথঞ্চন।
> অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকান"
> সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
> সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥ ৪র্থ অঃ।

অল্প-সত্ত্ব প্রাকৃত জনেরা জীবিকার দায়ে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ, স্বগুণানুখ্যাপন, প্রভুর অনুরূপ বেশাদিধারণ প্রভৃতি নানা অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু জীবিকার জন্য সেই লোকবৃত্তের কখন অনুকরণ করিবে না; যাহা দম্ভব্যাজাদিশূন্য, সরল, যে জীবিকা লাভে কিছু মাত্র শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা

অতি বিশুদ্ধ এইরূপ ব্রাহ্মণজীবিকা দ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিবেন। সুখার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ'।

আজকাল যে দিন সময় পড়িয়াছে তাহাতে অন্ন সংস্থানের চিন্তা সকল চিন্তাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই জীবিকাসঙ্কট কালে ব্রাহ্মণেরা যে একবারে শ্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন তাহার সম্ভাবনা নাই। অথচ তাঁহারা যদি ধনলোভে একান্ত মুগ্ধ হন তবে এ সমাজের আর উদ্ধারের আশা নাই। সুতরাং আমার মনে হয় যদি তাঁরা হাকিম হুকিম ওকালতী, চিকিৎসা, বাণিজ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল লোক শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হন অর্থাৎ স্কুলে শিক্ষকতা, কালেজে অধ্যাপকতা ও টোলে অধ্যাপকতার ব্যবসা মাত্র করেন তবে তাঁহারা জ্ঞানানুশীলন, শাস্ত্রচিন্তা, অধ্যাত্ম বিদ্যার অনুশীলন এবং সমাজ ও লোকহিতকর প্রভৃতি বহুধা শুভকার্য্যে অনেক সময় দিতে পারিবেন। তাহাতে সমাজের ও অন্যান্য জাতিরও যথেষ্ট সুবিধা, সাহায্য ও মঙ্গল হইবে। অবশ্য এর জন্য তাঁহাদের অর্থের পানে লোলুপ দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। ব্রাহ্মণেরাই তো সর্ব্বপ্রথমে ত্যাগের আদর্শ দেখাইবেন। ব্রাহ্মণ কখনও অর্থ ও সম্পদের সেবা করিবেন না—তাঁহারা চির-দিন স্বাধ্যায়রত হইয়া সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ও অলৌকিক বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবেন এবং জাতি নির্ব্বিশেষে সকলের কল্যাণে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়া এবং আপনার সমস্ত আশা ভগবানের

পাদপদ্মে বিলীন করিয়া—তাঁহার প্রেম ভক্তির—তাঁহার ধ্যান সমাধিতে আপনাকে সমাহিত করিয়া অকুতোভয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন—ইহাই ব্রাহ্মণের জীবনের আদর্শ—ইহাই সর্ব্বোত্তম মুক্তির পন্থা। হায় এই ব্রাহ্মণের পদ-রজঃস্পর্শে ভারতবর্ষ কি আবার পবিত্র হইবে না ?

তৃতীয় কাণ্ড।

বানপ্রস্থ।

তৃতীয় কাণ্ড।

—o*o—

প্রথম অধ্যায়।

প্রাচীনকালে দ্বিজাতিরা আজীবন সংসার লইয়া মগ্ন থাকিতেন না। বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইলে তাঁহারা অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আবার একান্ত অন্তঃকরণে পরমাত্মার ধ্যান-সমাধিতে মনোনিবেশ করিতেন। যৌবনে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবিধ বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, সুতরাং বিষয়-বাসনা-জনিত যে কলঙ্ক-কালিমা লাগে তাহাই আবার ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্যই এই তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থের ব্যবস্থা ছিল। এই আশ্রমে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া অনন্যমনে চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখী করিবার জন্য নিত্য-ধ্যান-ধারণায় বহুক্ষণ ক্ষেপণ করিতেন। এ আশ্রমেরও খুব কঠোর নিয়ম। অধুনা জগৎপূজ্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত দণ্ডাশ্রম অনেকটা এই তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থেরই অনুরূপ।

সংসারের সুখভোগ বা আরাম তো ঋষিদিগের লক্ষ্য ছিলনা, তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল কেবল স্বধর্ম্মপালন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ভগবৎপ্রেম তাঁহাদের সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিত। বাল্যে ও যৌবনের প্রারম্ভে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া ও যথোচিত বিদ্যা ও জ্ঞানকে উপার্জ্জন করিয়া,

পূর্ণ যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নে ও প্রৌঢ়াবস্থার সায়াহ্নে সংসারের গুরুভার বহন, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, সৎপুত্রোৎপাদন ও তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা, ধর্ম্মানুমোদিত অর্থের উপার্জ্জন ও তাহার যথাবিধি ব্যয়—এই সকল কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন—তারপর জীবনের সন্ধ্যাকালে যখন পুত্রেরা সাবালক ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছে, পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এ সময় তো জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পর বিশ্রামের সময়, আরামের সময়—কিন্তু সে সময় তাঁহারা করিতেন কি? তাঁহারা আরামের দিকে না তাকাইয়া, উপযুক্ত পুত্রের হস্তে গৃহ-পরিজনের ভার অর্পণ করিয়া সংসার হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেন। আর কাহারও পানে তাকাইতেন না। একবারে ঋষিমুনিসেবিত কোন নির্জ্জন তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন—তথায় জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে অনন্যমনে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন বলিয়া। সংসারে যেটুকু বাধাবিঘ্ন পাইয়াছেন, তাহাতে যে ক্ষতি হইয়াছে সেটুকু পূরণ করিবার জন্য, সংসারের বহুকর্ম্মে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে আবার পরিপূর্ণ ঈশ্বরনিষ্ঠ ও সংযত করিবার জন্য—তাঁহারা আরামকে তুচ্ছ করিয়া, ভোগস্পৃহাকে পদদলিত করিয়া—আবার এই বানপ্রস্থের কঠোর তপস্যাকে স্বীকার করিবার জন্য উদ্যত হইতেন। বর্ত্তমান কালের লোকদের মত হুমড়ি খাইয়া মরণান্ত পর্য্যন্ত সংসারকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন না। ইহাতে একটা মস্ত লাভ হইত এই, যে সংসার চিরদিনকার মত তাঁহাদের অন্তঃকরণকে ঘেরিয়া থাকিতে পারিত না। এখন যেমন সংসারকে

কিছুতেই আমরা ছাড়িতে পারি না—কোন জরুরী তাগিদের জন্যও নহে। ইহা চরিত্রের একটি মস্ত দুর্ব্বলতা। তারপর আমার আর একটা কথা মনে হয়, যে বানপ্রস্থাশ্রমটি বজায় থাকিলে সন্তান-সন্ততিদের বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতির কোনও হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং বৃদ্ধ বয়সে যে কয় দিন তাঁহারা গৃহে থাকেন, সে সময়ে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষারও কোন অভাব ঘটে না। কারণ পুত্র ও পুত্রবধূ যদি স্বভাবতঃই পিতৃমাতৃনিষ্ঠ নাও হয়, তথাপি তাহাদের এই কথা মনে হইবে যে বাপ, মা আর কদিনই বা সংসারে আছেন? যে কটা দিন থাকেন তাঁহাদের সেবা ও মর্য্যাদার ত্রুটি না হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে স্বতঃই তাহাদের চিত্তে আগ্রহ জন্মে। সুতরাং সংসার জীবনের অবসান কালে, পিতা মাতা অক্ষমতা প্রযুক্ত কোন কষ্ট পান না; তখন তাঁহাদের প্রত্যেক কষ্টটি, শ্রদ্ধালু অন্তঃকরণে ও প্রেমের সহিত অপনয়ন করিবার প্রবৃত্তি অত্যন্ত কুসন্তানের পক্ষেও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আর যেখানে সন্তানেরা জানে, এই বৃদ্ধগুলিকে তাহাদের আমরণ সেবা করিতে হইবে—অথচ তাঁহাদের দ্বারা সংসারের আর কোন লাভের আশা নাই (সংসার কি স্বার্থপর!!) বরং তাঁহাদের অবিরত ভর্ৎসনা বিরক্তিতে সংসারে শান্তি চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা—সে অবস্থায় অনেকের পক্ষে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে! অবশ্য একান্ত পিতৃমাতৃসেবা-পরায়ণ আদর্শ সুপুত্রের যদিও এখন নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটে নাই, তথাপি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়,

এরূপ সন্তানের সংখ্যা আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বড় অধিক নয়। অনেকে চমকিয়া উঠিতে পারেন এবং বলিতে পারেন "পিতামাতাকে আজীবন সেবা করা আর কি কঠিন"? কিন্তু ইহা ঠিক নয়— কঠিনই বটে! প্রতিদিনের ঘটনা যাহা আমাদের চোখে পড়িতেছে তাহাতে দেখিতে পাই—অর্থসামর্থ্যহীন বৃদ্ধ পিতামাতাদের বাস্তবিকই সেবার ত্রুটি হয়। সে যে খালি পুত্রের দোষ তা ত নয়—কারণ একা পুত্রইতো সংসারের সব নয়। সেই জন্য আমার মনে হয়, পূর্ব্বকালের মত বৃদ্ধ হইলেই গৃহ হইতে সরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, ইহাতে তাঁহাদের মান মর্য্যাদা সমস্তই বজায় থাকে। আরও একটা দিক ভাবিবার কথা আছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধারাই যদি চিরদিন সংসারকে জুড়িয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে তো চলিবে না; সকলকেই সময়ানুযায়ী স্থান ছাড়িয়া দিতে হইবে। তা ছাড়া সংসারে থাকিলে আজ ইহার পীড়া, কাল উহার মৃত্যু, আজ এই অভাব, কাল আর এক কষ্ট, নানাবিধ দুঃখ সন্তাপ এতো লাগিয়াই থাকিবে; এই লইয়া "বৃদ্ধ—স্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ"—সুতরাং "পরমে—ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ"—এটাও তো খুব ভাল কথা নহে।

যদি কেহ বলেন আজ কাল অরণ্য কোথায় পাইব? আমি বলি সে ভাবনা ভাবিয়া বিকল হইবার প্রয়োজন নাই। বৃদ্ধরা সাহস করিয়া, সংসারের মায়া ছাড়িয়া, একবার গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেই সব সুযোগ মিলিয়া যাইবে। যদি অরণ্য নিতান্তই দুর্লভ হয় বা অরণ্যে বাস একান্ত অসুবিধাজনক হয়, তবে বৃদ্ধরা গৃহ ছাড়িয়া অন্ততঃ কোন তীর্থ অথবা নির্জ্জন পবিত্র স্থানে যেন তাঁহারা

বাস করেন। তাঁহাদের প্রতি আমার একটি অনুরোধ এই যে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া আর যেন গৃহস্থালীর খবরাখবরের জন্য তাঁহাদের চিত্ত চঞ্চল না হয়। ছেলে মেয়েরা যাহা জানে যাহা বুঝে করুক্—তাহা তাঁহার জানিবার প্রয়োজন নাই। তখন তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য এই একান্তচিত্তে ভগবদ্‌পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া থাকা!

এই নিয়ম যদি পুনঃ প্রচলিত হয়, তবে আমাদের সংসারের অনেক দুঃখ অশান্তি দূর হইয়া যায়, দেশের কল্যাণ ও দেশবাসীর কল্যাণ হয়। কারণ এই সকল বৃদ্ধের ধ্যানলব্ধ গভীর শান্তি, ভক্তিনিষ্ঠ-প্রাণের একান্ত নির্ভরতা, সমাহিত-চিত্তে সত্যের সমুজ্জ্বল দীপ্তি—সমগ্র সংসারকে এক সত্য আনন্দরসের দিকে সুবেগে আকর্ষণ করিবে, তখন বনের জন্যই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে! আবার তপোবনের স্নিগ্ধ-শ্যামল-ছায়ায়, অভিনব আরণ্যকের সামগানে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে। ইহা কি নিতান্তই দুরাশা? হে কল্যাণেচ্ছু ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ! আপনারা আবার আপনাদের পিতামহ ঋষিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। মোহবিভ্রান্ত হইয়া চিত্তকে আর সংসারগর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না। সাধন সম্পন্ন হইয়া ভূমানুসন্ধানে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখুন। ইহাতেই আপনাদের জন্ম ও জীবন সফল হইবে; ভগবচ্চরণচুম্বিত অমৃত ধারায় আপনাদের চিত্ত শীতল হইবে—এই মৃত জগতেই আপনারা অমৃতের সন্ধান পাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বানপ্রস্থাশ্রমীদের জন্ম মনুর নিয়ম।

"এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্বা বিধিবৎ স্নাতকো দ্বিজঃ।
বনে বসেৎ তু নিয়তো যথাবদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ" ॥মনু ৬ষ্ঠঃ অ

'এইরূপে স্নাতক দ্বিজ যথাশাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া নিয়মযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন'।

বানপ্রস্থের উপযুক্ত কাল।

"গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ" ॥
মনু ৬ষ্ঠঃ।

'গৃহস্থ যখন দেখিবেন যে, আপনার গাত্রচর্ম্ম লোল হইয়াছে, কেশের পক্কতা জন্মিয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহার অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য'।

বানপ্রস্থীর প্রথম অনুষ্ঠান ও তদনন্তর কর্ত্তব্য।

"সন্ত্যজ্য গ্রাম্যমাহারং সর্ব্বঞ্চৈব পরিচ্ছদম্।
পুত্রেষু ভার্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা" ॥
৬ষ্ঠ অঃ।

'গ্রাম্য আহার ও সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগ করিয়া, পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া অথবা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি বনগমন করিবেন'।

"অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নি পরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ" ॥
"মুন্যন্নৈর্বিবিধৈর্ম্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান নির্ব্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকম্" ॥

'শ্রৌতঅগ্নি, গৃহ্যঅগ্নি এবং স্রুক্‌স্রুবাদি উপকরণ সমুদায় গ্রহণ করিয়া, গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া তথায় বাস করিবেন। নীবারাদি মুনিজনভক্ষ্য পবিত্র অন্ন অথবা শাকমূল ও ফল প্রভৃতি বনজাত দ্রব্যের দ্বারা বিধি পূর্ব্বক পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন'।

"বসীত চর্ম্ম চীরং বা সায়ং স্নায়াৎ প্রগে তথা।
জটাশ্চ বিভৃয়ান্নিত্যং শ্মশ্রুলোমনখানি চ" ॥

'অরণ্যবাস কালে মৃগাদি চর্ম্ম বা তৃণ বল্কলাদি বস্ত্রখণ্ড পরিধান, সায়ং প্রাতঃস্নান এবং নিত্য জটা, শ্মশ্রু, নখ ও লোম ধারণ করিবেন'।

বানপ্রস্থীর অতিথি সৎকার।

"যদ্ভক্ষ্যং স্যাৎ ততো দদ্যাদ্বলিং ভিক্ষাংশ্চ শক্তিতঃ।
অম্মূল ফলভিক্ষাভিরর্চ্চয়েদাশ্রমাগতান্" ॥

'তাঁহার যাহা ভক্ষ্য থাকিবে, তাহা হইতে বলি প্রদান ও ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিতে হইবে এবং আশ্রমাগত অতিথি অভ্যাগতকে জল, মূল ফল যাহা থাকিবে তদ্দ্বারা তিনি অর্চ্চনা করিবেন'।

বানপ্রস্থীর ধর্ম্ম।

"স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রং সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ" ॥

'বানপ্রস্থী নিত্যই অধ্যয়নরত, দমগুণসম্পন্ন অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনশীল হইবেন। তিনি পরোপকারী দানশীল প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত এবং অনুকম্পাপরায়ণ হইবেন'।

বানপ্রস্থীর নিষিদ্ধ ভক্ষ্য।

"বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবকানি চ।
ভূস্তৃণং শিগ্রুকঞ্চৈব শ্লেষ্মাতকফলানি চ" ॥

'মধু, মাংস, ভূমিজাত ছত্রাক, ভূস্তৃণ, শিগক (এক প্রকার শাক) এবং শ্লেষ্মাতক ফল—বানপ্রস্থী এ সকল বর্জ্জন করিবেন'।

"ন ফালকৃষ্ট মশ্নীয়াদুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ।
ন গ্রামজাতান্যার্ত্তোঽপি মূলানি চ ফলানি চ"॥

'ফালদ্বারা বিদারিত ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদি যদি কেহ পরিত্যাগও করিয়া থাকে তথাপি বানপ্রস্থী তাহা আহার করিবেন না; অথবা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইলেও গ্রামজাত ফলমূলাদি ভক্ষণ করিবেন না'। (পাছে গ্রাম্য-আহার করিতে করিতে আবার জনসমাজে অনুরাগ হয়—বোধ হয় এই জন্যই এত যত্ন করিয়া মনু গ্রাম্যজাত ফলমূলাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন)।

বানপ্রস্থের ভোজনে সংযম অভ্যাস।

"নক্তঞ্চান্নং সমশ্নীয়াদ্দিবা বাহৃত্য শক্তিতঃ।
চতুর্থ কালিকো বা স্যাৎ স্যাদ্বাপ্যষ্টমকালিকঃ"॥

'শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করিয়া, সায়াহ্নে অথবা দিবাতে ভোজন করিবেন। অথবা চতুর্থ কালিক অর্থাৎ একদিন উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন; অথবা অষ্টম কালিক অর্থাৎ তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন'।

বানপ্রস্থের উগ্র তপস্যা।

"গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তু স্যাদ্বর্ষাস্বভ্রবিকাশিকঃ।
আর্দ্রবাসাস্তু হেমন্তে ক্রমশো বর্দ্ধয়ং স্তপঃ"॥

'গ্রীষ্মে পঞ্চতপা (চতুর্দ্দিকে অগ্নি জ্বালিয়া) হইয়া ও বর্ষায় ছত্রাদি শূন্য হইয়া শিরে বৃষ্টিপাত গ্রহণ করিয়া এবং হেমন্তে আর্দ্রবাস পরিধান পূর্ব্বক তপস্যার বৃদ্ধি করিবেন'।

"উপস্পৃশং স্ত্রিষবণং পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
তপশ্চরংশ্চোগ্রতরং শোষয়েদ্দেহমাত্মনঃ"॥

'ত্রৈকালিক স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ করিবেন এবং উগ্রতর তপস্যা দ্বারা দেহকে শোষণ করিবেন'।

বানপ্রস্থের অগ্নি ও গৃহত্যাগ এবং মৌনব্রত ধারণ।

"অগ্নীনাত্মনি বৈতানান্ সমারোপ্য যথাবিধি।
অনগ্নিরনিকেতঃ স্যান্মুনির্মূলফলাশনঃ"॥

'বৈখানস শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রৌতাগ্নি সকল আত্মাতে আরোপ করিয়া, অগ্নিশূন্য ও গৃহশূন্য হইয়া মৌনব্রত ধারণ করিয়া ফলমূল ভোজনে কালযাপন করিবেন'।

বানপ্রস্থার সুখভোগে যত্নশূন্যতা।

"অপ্রযত্নঃ সুখার্থেষু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ।
শয়নেষ্বমমশ্চৈব বৃক্ষমূলনিকেতনঃ"॥

'বানপ্রস্থী সুখকর বিষয়ে যত্নশীল হইবেন না, ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী হইয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিবেন। বাসস্থানে মমতাশূন্য হইয়া বৃক্ষমূলে বাস করিবেন'।

(গীতাতেও 'অনিকেত' হইবার উপদেশ আছে)

বানপ্রস্থের ভিক্ষাচরণ।

"তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাহরেৎ
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু"॥

'ফল মূলাভাবে তাপস ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে প্রাণ ধারণের উপযোগী ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন; ইহারও অভাব ঘটিলে বনবাসী অন্যান্য দ্বিজাতিবর্গের নিকট হইতে ভিক্ষা আহরণ করিবেন'।

পুত্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও বানপ্রস্থী গ্রহণ করিতে পারেন।

"সংনস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ম্মদোষানপানুদন্।
নিয়তো বেদমভ্যস্য পুত্রৈশ্বর্য্যে সুখং বসেৎ"॥

'গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মদোষ সকল সাধনোপায় দ্বারা নাশ করতঃ যম নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক বেদপাঠে রত থাকিয়া পুত্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিবে।

বর্ত্তমানকালে পেন্সন লইয়া, অথবা কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিয়া, সকল ভদ্র লোকেই কোন নির্জ্জন তীর্থে বাস করিয়া তপোবল বৃদ্ধি করিতে পারেন। উপযুক্ত পুত্রের মাসিক-দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াও তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিন ধ্যান-ধারণাতে মগ্ন হইয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন।

"অপরাজিতামাস্থায় ব্রজেদ্দিশমজিহ্মগঃ।
আনিপাতাচ্ছরীরস্য যুক্তো বার্য্যনিলাশনঃ"॥

'এইরূপ করিতে করিতে যদি অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হন, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত দেহের পতন না হয়, তাবৎকাল জলবায়ু ভক্ষণ করত যোগনিষ্ঠ হইয়া ঈশান কোণে সরল পথে গমন করিবেন'।

চতুর্থ কাণ্ড।

—————০**—————

সন্ন্যাসাশ্রম।

চতুর্থ কাণ্ড।

—:০:—

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ আশ্রমই সন্ন্যাস আশ্রম। যথাবিহিত তিনটি আশ্রমের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে, তবে এই আশ্রমের অধিকারী হওয়া যায়। যিনি এই তিন আশ্রমের বিহিত নিয়মাদি পালন না করিয়া একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহার সন্ন্যাস বিধিসঙ্গত বা বেদানুযায়ী সন্ন্যাস নহে। তবে তীব্র বৈরাগ্যবান পুরুষ অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর কথা স্বতন্ত্র। বৌদ্ধযুগে এবং শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ও তদনুগত শিষ্যদিগের দ্বারা এবং তৎপথাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য্য ও তাঁহাদের শিষ্যদিগের দ্বারা, এদেশে আশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসব্রতীদিগের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া গিয়াছে। আজ কালও জ্ঞানবৈরাগ্যবিহীন ভক্তিশ্রদ্ধাবর্জ্জিত অনেক লোকই নানা কারণে এই আশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যথার্থ বৈরাগ্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই এই আশ্রম গ্রহণ করায়, তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ সন্ন্যাসের লক্ষণ সকল পরিস্ফুট হইতেছে না। বৈদিক নিয়ম ও মনুর মতানুযায়ী এই আশ্রমের অধিকার লাভ হইবার পর, সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলে সন্ন্যাসের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, নচেৎ যথেষ্ট পরিমাণে বকব্রতী দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় মাত্র। সেই জন্য শাস্ত্রও বিষয়াসক্ত পুরুষ দিগের পক্ষে সন্ন্যাস নিষেধ করিয়াছেন।

'সরাগো নরকং যাতি প্রব্রজন্ হি দ্বিজাধমঃ'

অবশ্য বিষয়ানুরাগ থাকিতেও অনেকে নানাকারণে সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন এই জন্যই শাস্ত্রের এই নিষেধ বাক্য। সন্ন্যাসীরা সমস্ত সমাজের এবং সর্ব্ববর্ণের গুরু। তাঁহারা লোকহিতার্থী, যথার্থ নিষ্কামধর্ম্মী, সেই জন্য অন্তঃপুরের কুলবধূ হইতে মহারাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। সাধক মাত্রেই, এমন কি দুই একটা যোগৈশ্বর্য্য থাকিলেও, যে তিনি সন্ন্যাসের অধিকারী তাহা নহে। দেখিতে হইবে—যথার্থ বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে কিনা, হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে কিনা? হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন ও সংশয় ছিন্ন হইয়াছে কিনা? তা যদি না হইয়া থাকে, তবে তিনি সমাজের, জনসমূহের ও আপনার বিবিধ প্রকারে অমঙ্গল সাধন করিবেন। সেই জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই হইল না। যদি যথার্থ বৈরাগ্য না হইয়া থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই আপনার ও জগতের অনিষ্ট করিবেনই, কিন্তু এরূপ অনিষ্ট করায় তো ধর্ম্মতঃ কাহারও অধিকার নাই। সুতরাং আমার মনে হয়, সন্ন্যাসীদের যদি এমন একটি সমাজ থাকে, যেখানে তাঁরা স্বভাব, চরিত্র, বৈরাগ্য দেখিয়া উপযুক্ত লোকদিগকে বাছিয়া লইতে পারিবেন—এবং অবশিষ্ট গুলিকে ভাগাইয়া দিবেন—তাহা হইলে এই আশ্রমে অকর্ম্মণ্য মূর্খ বৈরাগ্যহীন পুরুষেরা নিরবধি ভিড় করিতে পারে না। ইহাতে বাস্তবিকই সমাজের অনিষ্ট হইতেছে। প্রাচীন কালে যখন লোকে এই আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহাদের বয়স অন্ততঃ ৭০।৭৫ এবং বানপ্রস্থাশ্রমেও যথেষ্ট সাধন ও তীব্র নিয়মের মধ্যে জীবনের সুদীর্ঘকাল যাপিত—সুতরাং সেরূপ পুরুষদিগের

মধ্য হইতে বৈরাগ্যহীন সন্ন্যাসীর সংখ্যা যে অধিক হইবে এরূপ সম্ভাবনা নিশ্চিতই বিরল। হিন্দুসমাজে সন্ন্যাসীদের খুব মর্য্যাদা সত্য; কিন্তু অসন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্ব সম্মান নষ্ট করিতেছেন। ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই।

"গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থানাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥"

(শ্রীভগবান বলিয়াছেন) আমার কটিদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, আমার হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থ এবং আমার মস্তক হইতে সন্ন্যাস উৎপন্ন হইয়াছে'।

"কুলানাঞ্চ শতং পূর্ব্ব মপরঞ্চ শত ত্রয়ম্।
এতৎ স্যাৎ সুকৃতে লোকে সন্ন্যস্তস্য কুলেঽস্তি যৎ"॥

'সন্ন্যস্ত ব্যক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী শতকুল এবং পরবর্ত্তী তিনশত কুলের স্বর্গলাভ হয়'। 'বরিষ্ঠো নাম-সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণেষু দশেষ্বপি'। 'নামে মাত্র সন্ন্যাসীও দশজন ব্রাহ্মণের তুল্য'। তার পর

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ"॥

'অপার সম্বিৎসুখ সমুদ্রে—পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত বিলীন হইয়াছে তাঁহার দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা ও বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইয়া থাকেন'।

"সন্ন্যাসের" এরূপ প্রশংসা শুনিয়া সন্ন্যাসী হওয়ার লোভ ত্যাগ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়। তাছাড়া যে কোন একটা লোককে হয়তো সমাজে কেহই জিজ্ঞাসাও করিবে না, কিন্তু কাষায় বস্ত্রধারী,

মুণ্ডিতমস্তক অথবা জটাধারী দেখিলে ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, সদ্গৃহস্থেরা তাঁহার সেবা করিতে পারিলে জীবনকে ধন্য মনে করে—সুতরাং অনেক নীচপ্রকৃতি লোভী লোক অনায়াসে ঐরূপ ভোগও সম্মানপ্রত্যাশায় সন্ন্যাসবেশধারী হইয়া থাকেন। সংসারে যিনি যতবড়ই গণ্য মান্য বিদ্বান হউন না কেন, যতি দিগকে লঙ্ঘন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না—এমন কি অশঙ্কচিত্তে অন্তঃপুরের মধ্যেও তাঁহাদের স্থান দিতে দ্বিধা বোধ হয় না; সুতরাং যতি যদি অসংযত, লোভী হন তবে তাঁহার দ্বারা কত অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতে পারে ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। বর্ত্তমান কালে ঐ সকল কপট সন্ন্যাসীর দ্বারা কত সৎকুলোদ্ভব গৃহস্থই যে বিড়ম্বিত হইতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হায়! ঔষধ দিতে পারিলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায়, না ভেল্কি দেখাইয়া ভাল মানুষের চোখে ধূলা নিক্ষেপ করিতে পারিলেই পরমার্থলাভ হয়? যাঁহারা স্বকর্ম্মদ্বারা এইরূপে যথার্থ ত্যাগী দিগের প্রতিও অশ্রদ্ধা আনিয়া দিতেছেন—তাঁহাদের কর্ম্মফলের ভীষণতার কথা ভাবিয়া আমার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

যদিও শ্রুতিতে আছে 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' যে দিনেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইবে সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে' কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য হইলে তবে তো! তীব্র বৈরাগ্য কয় জনের উদয় হয়? যাঁহাদের সাধনলব্ধ জ্ঞান দ্বারা মনের ময়লা ধুইয়া গিয়াছে, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা অশুভ বাসনাক্ষয় হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়াছে—তাঁহাদের হৃদয়েই এই জগতের

ক্ষণিকত্ব ও অসারত্ব উপলব্ধি হয়; তাঁহারাই হাড় মাসের মায়া ত্যাগ করিয়া "মনের মানুষের" অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। সুতরাং বাসনাশুদ্ধি যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে, ততক্ষণ ভগবৎ-প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে; অনেক তপস্যা করিলে, অনেক মাথা খোঁড়া খুঁড়ি করিলে, তবে প্রকৃত যোগ্যতালাভ হয়। তাহার পূর্ব্বে বৈরাগ্য গ্রহণ "নাম সন্ন্যাস" মাত্র। কখন মানুষ ইহকৃত কর্ম্মের জন্য পাপপুণ্যভাগী হয় না? কখন প্রকৃত সন্ন্যাসের অধিকার হয়? যখন

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"॥

'যিনি আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আপনার মধ্যেই আপনি ভোর তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আর কিছুই নাই'। নচেৎ যাঁহাদের মন হইতে বিষয়-বাসনা পরিত্যক্ত হয় নাই, অথচ তাঁহারা আগেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের আচরণকে ভগবান্ কপটাচার বলিয়াছেন। কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মপাশ ছিন্ন হইবার নহে।

'ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি"।

সুতরাং মনুর মতে ক্রমশঃ আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। ইহাতে পতনের সম্ভাবনা কম থাকে। তবে তীব্র বৈরাগ্যবান পুরুষের কথা স্বতন্ত্র ইহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

তবে মনুরও ২।১টি স্থান পড়িলে এই ধারণা হয় যে তাঁহার

মতেও গৃহস্থাশ্রম সমাপ্তির পরই কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন না করিয়া, একেবারে শিখাসূত্রত্যাগ করিয়া পরিব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। এই পরিব্রাজকেরা সন্ন্যাসীরই অনুরূপ। বোধ হয় গৃহস্থালী করিতে করিতে যে দ্বিজের চিত্তে বৈরাগ্যের প্রচণ্ড অনল জ্বলিয়া উঠিত—তাঁহার আর তৃতীয় আশ্রম লইবার আবশ্যক হইত না। তাঁহার কর্ম্মপাশ ছিন্নই হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কর্ম্মপাশকে শিথিল করিবার জন্য তৃতীয় আশ্রমের নিয়মনিষ্ঠা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক। মনু বলিতেছেন

"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদ সদক্ষিণাম্"।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ"॥
"যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

'প্রজাপতিযাগ সমাধা করিয়া, সর্ব্বস্ব দক্ষিণান্ত করিয়া, আত্মাতে অগ্নি আধান পূর্ব্বক গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিবেন; যিনি সর্ব্বভূতে অভয়দান করিয়া গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করেন, সেই ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি তেজোময় লোক সকল লাভ করেন'।

চতুর্থ আশ্রম লইতে সাধারণতঃ মনু কখন বলিয়াছেন?

"বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ"॥
"আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে"॥

'মৃত্যু না হইলে এইরূপে বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয়ভাগ যাপন করিয়া, চতুর্থভাগে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের

অনুষ্ঠান করিবে। আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিয়া এবং তত্তৎ আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাধান করিয়া ভিক্ষাদান বা বলিদানাদি কর্ম্মে শ্রান্ত হইলে পর, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে পরলোকে অভ্যুদয় লাভ করা যায়'।

সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম। "আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ" ॥
এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সম্পশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে" ॥
"অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্ গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসঙ্কসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ" ॥

'গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্র দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া, কাম্যবিষয় উপস্থিত থাকিলেও তাহাতে আস্থাশূন্য হইয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক পরিব্রাজক ধর্ম্মের আচরণ করিবে। সর্ব্বসঙ্গ-রহিত হইলে সিদ্ধিলাভ হয় জানিবে। আত্মসিদ্ধির জন্য তখন অসহায় অবস্থায় নিত্য একাকী বিচরণ করিবেন; যিনি সঙ্গশূন্য হইয়া বিচরণ করেন, তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না অথবা কাহা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন না। সন্ন্যাসাশ্রমে অগ্নিহীন, বাসহীন ব্যাধিপ্রতিকারের উপেক্ষাকারী, স্থিরমতি, এবং সদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অরণ্যে যাপন করিবেন; কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামের আশ্রয় লইবেন'।

যতি কখন ও কোথায় ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। "বিধূমে সন্নমূষলে ব্যঙ্গারে ভুক্তবর্জ্জনে।
বৃত্তে শবাবসম্পাতে ভিক্ষাং নিত্যং যতিশ্চরেৎ ॥"

'গৃহস্থের গৃহে পাকধূম বিগত হইলে, উদূখল-মূষলের কার্য্য সমাপ্ত হইলে, পাকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, গৃহস্থ পর্য্যন্ত সমুদায় লোকের আহার সমাপন ও আহারের উচ্ছিষ্ট পত্রাদি ফেলিলে, অর্থাৎ দিবসের অপরাহ্ণ ভাগে যতি ভিক্ষাচরণ করিবেন'।

"ন তাপসৈর্ব্রাহ্মণৈর্বা বয়োভিরপি বা শ্বভিঃ।
আকীর্ণং ভিক্ষুকৈর্বান্যৈরাগারমুপসংব্রজেৎ"॥

'যে গৃহস্থের ভবন—বানপ্রস্থ, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ভক্ষণশীল কুক্কুর বা অপর কোন ভিক্ষার্থীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে এতাদৃশ গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা কামনায় যতির গমন করিতে নাই'।

যতির ইন্দ্রিয় জয় ও সাধনা।

"অলাভে ন বিবাদী স্যাল্লাভেচৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণ যাত্রিকমাত্রঃ স্যান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ"॥

'ভিক্ষাদির অলাভে বিষণ্ণ হইবেন না, লাভেও আহ্লাদিত হইবেন না; যাহাতে প্রাণযাত্রা মাত্র চলিয়া যায় এইরূপ করিবেন; অপরাপর ব্যবহার্য্য দ্রব্যের আসক্তি হইতেও মুক্ত থাকিবেন'।

"অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ"॥

'অতিশয়োক্তি বা অপমানজনক বাক্য সকল সহ্য করিয়া থাকিবেন; কাহাকেও অপমান দ্বারা পরাভব করিবেন না', এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না'।

(ইহা সংসারী জীবনের পক্ষেও অমৃত স্বরূপ)।

"অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ"॥

'সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবেন; কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিবেন না; সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হইবেন; কেবল আত্মসহায়ে একাকী মোক্ষার্থী হইয়া ইহ সংসারে বিচরণ করিবেন'।

"সূক্ষ্মতাঞ্চান্ববেক্ষেত যোগেন পরমাত্মনঃ।
দেহেষু চ সমুৎপত্তিমুত্তমেষ্বধমেষু চ"॥

'যোগের দ্বারা পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ব, নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্ম স্বরূপের উপলব্ধি করিবেন এবং কি উত্তম কি অধম সর্ব্ব দেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে ইহা অনুচিন্তন করিবেন'।

যতিদের প্রায়শ্চিত্ত।

"অহ্নরাত্র্যা চ যান্ জন্তূন হিনস্ত্যজ্ঞানতো যতিঃ।
তেষাং স্নাত্বা বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাণায়ামষড়াচরেৎ"॥

'যতিরা অজ্ঞান বশতঃ দিবারাত্রির মধ্যে যে সকল প্রাণী বিনাশ করেন, সেই পাপ বিশুদ্ধির জন্য স্নান করিয়া ছয়বার প্রাণায়াম করিবেন।'

প্রাণায়াম করিবার প্রয়োজন কি?

"দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥"

'সুবর্ণ রজতাদি ধাতুর মল সকল, অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত হইলে যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদায় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়।'

চিত্তবিকার ও অনীশ্বর ভাব সকল দূর করিবার উপায় প্রাণায়াম, ধ্যান ধারণা ইত্যাদি।

"প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্"॥

'প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয় বিকারাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবে; ধারণা (স্থান বিশেষে চিত্তবন্ধ রূপ) দ্বারা পাপ সকল (অর্থাৎ মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা) নষ্ট করিবে; প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সংসর্গ (ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি) হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং ধ্যানের দ্বারা অনীশ্বর ভাব সকলকে (অশ্রদ্ধা, অভক্তি প্রভৃতি) জয় করিবে।'

যতির সংসার গতি প্রাপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই কেন?

"সম্যগ্‌দর্শন সম্পন্নঃ কর্ম্মভির্ন নিবধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতিপদ্যতে"॥

'ধ্যানযোগে সম্যক আত্মদর্শন সম্পন্ন ব্যক্তি পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা সংসার বন্ধনে পতিত হন না; আত্মদর্শন হীন ব্যক্তিই সংসার গতি প্রাপ্ত হয়'।

মুক্ত সন্ন্যাসী ও ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ।

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"
"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥"
"অনপেক্ষঃশুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।"
"সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥"
"মানাপমানয়োস্তুল্য স্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥"

(ভগবদ্গীতা ১২শ প ১৪শ অধ্যায় দেখুন)

"কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্" ॥
"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃত্যকো যথা ॥"

'মৃণ্ময় শরাবাদি ভিক্ষা পাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষ মূল, জীর্ণ কৌপিনাদি বসন, অসহায় ভাবে একাকী অবস্থান, সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি—এই সকল মুক্তের লক্ষণ।'

'যতি জীবন বা মরণ কিছুই কামনা করিবেন না, ভৃত্য যেমন প্রভুর নিদেশের জন্য প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ তিনি কালের প্রতিক্ষা করিয়া থাকিবেন।'

সন্ন্যাসীর তীর্থ।

"তপস্তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং ধ্যানং তীর্থমনুত্তমম্ ॥"

'তপস্যা, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জীবগণের প্রতি মোক্ষোপদেশরূপ দয়া, এবং ধ্যানাভ্যাসই সন্ন্যাসীর পক্ষে পরম তীর্থ স্বরূপ'।

সন্ন্যাসীর কর্ম্মযোগ।

"ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
যতেশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥"

ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা এবং একান্তে বাস এই চারিটী ব্যতীত সন্ন্যাসীর পক্ষে পঞ্চম বলিয়া আর কোন কর্ম্ম নাই।

পরিশিষ্ট।

(মনুকথিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ)।

ধর্ম্মের লক্ষণ।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী র্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম॥

'ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ'।

ধর্ম্মলাভের উপায়।

"বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্"।

'যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রম বিহিত বেদোক্ত কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাদি যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিলেই দ্বিজ পরমাগতি লাভ করিয়া থাকেন'।

ধর্ম্মকে জানিবার উপায়।

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"

'বেদ এবং বেদমূলক ধর্ম্মোপদেশ, যিনি বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানিতে পারেন, অপরে নহে'।

ধর্ম্মলাভের অধিকারী।

"অর্থ কামেষ্বসক্তানাং ধর্ম্মজ্ঞানং বিধীয়তে।
ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ"॥

'অর্থ ও কামে আসক্তি শূন্য ব্যক্তিগণেরই ধর্ম্মজ্ঞান হয়। ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের বেদই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।'

পরম ধর্ম্ম কি?

"বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তং হ্যস্যাহুঃ পরং ধর্ম্মং ধর্ম্মমুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥"

'নিরলস হইয়া প্রতিদিনই প্রণব গায়ত্র্যাদি বেদাভ্যাস করিবে। ইহাই পরম ধর্ম্ম; অন্য যাহা কিছু তাহাকে উপধর্ম্ম বলা চলে।'

ধর্ম্ম পালনে ও সদাচারে জাতিস্মরত্ব।

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈবচ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্ব্বিকীম্" ॥

'সতত বেদাভ্যাস (প্রণব, গায়ত্রী জপ) বাহ্যান্তর শৌচ, তপস্যা এবং সর্ব্বজীবে মৈত্রী ভাব, এই সকল অনুষ্ঠানে দ্বিজ "জাতিস্মর" হন।'

জাতিস্মর হওয়ার ফল বৈরাগ্য ইত্যাদি।

"পৌর্ব্বিকীং সংস্মরন্ জাতিং ব্রহ্মৈবাভ্যস্যতে পুনঃ
ব্রহ্মাভ্যাসেন চাজস্রমনন্তং সুখমশ্নুতে॥"

'জাতিস্মরত্ব লাভ হইলে বৈরাগ্যোদয় হইয়া সংসার বন্ধন ছিন্ন হয়; তিনি তখন মোক্ষৈকহেতু ব্রহ্মলাভের চেষ্টা করেন এবং বেদাভ্যাস বলে ব্রহ্মলাভ করিয়া অজস্র মধ্যে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন।'

শয্যাত্যাগ ও তদনন্তর কর্ত্তব্য।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চানুচিন্তয়েৎ।
কায়ক্লেশাংশ্চ তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ"॥ ৪ অঃ।

'ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে (রাত্রির শেষ প্রহরে) জাগরিত হইবে। জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থ এবং কিরূপ কায়ক্লেশে তাহা লভ্য ইহা চিন্তা করিবে এবং বেদতত্ত্বার্থ নিরূপণ করিবে'।

শৌচ ও সন্ধ্যা

"উত্থায়াবশ্যকং কৃত্বা কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ স্বকালে চাপরাং চিরম্" ॥

'তদনন্তর শয্যা হইতে উঠিয়া আবশ্যক মল মূত্র ত্যাগ করিয়া শুচি হইয়া সমাহিত মনে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ করিবে এবং অপর সন্ধ্যা কালেও গায়ত্রী জপ করিবে'।

সন্ধ্যাবন্দনাদি করার ফল।

"ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ"॥

'ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ধ্যা করেন বলিয়া দীর্ঘ আয়ুঃ, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন'।

গায়ত্রী জপের ফল।

"যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্" ॥
"যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্"॥
"জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে"॥

"যিনি প্রতিদিন নিরলস হইয়া তিন বৎসর যাবৎ প্রণব ও ব্যাহৃতি যুক্ত ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরম ব্রহ্মলাভ করেন। বায়ুর ন্যায় তিনি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। দেব, ভূত, মনুষ্য এবং পিতৃ—এই যে চারিটি মহাযজ্ঞ ইহাদের সহিত যদি দশপৌর্ণমাসাদি সমুদায় বেদবিহিত যজ্ঞ যোগ করা যায় তথাপি ইহাদের সমগ্র পুণ্যফল ও ব্রহ্মযজ্ঞরূপ জপযজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও এক ভাগ

হয় না।' জ্যোতিষ্টোমাদি অন্য কোন বৈদিক কার্য্য করুন আর নাই করুন ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জপ বলে সিদ্ধিলাভ করিবেন, ইহাতে আর সংশয় নাই'।

সদাচারী, জিতেন্দ্রিয় ও গায়ত্রী জপকারীর বিনাশ হয় না।

"মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রযতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যমগ্নিমতন্দ্রিতঃ"॥
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।
জপতাং জুহ্বতাং চৈব বিনিপাতো ন বিদ্যতে"॥

'সদাই মঙ্গলাচার যুক্ত হইবে, বাহিরে ও অন্তরে সদা শুচি থাকিবে; জিতেন্দ্রিয় হইবে এবং আলস্য শূন্য হইয়া গায়ত্রী জপ ও অগ্নিতে বিহিত হোম করিবে। মঙ্গলাচারযুক্ত, নিত্য সংযতাত্মা, জপ হোম কারী জনের বিনিপাত হয় না'।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্ম্মের ফল।

"প্রবৃত্তং কর্ম্মসংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ"॥

'প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত কর্ম্মাভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়'।

নিবৃত্তিমার্গ বা মোক্ষ সাধনের ক্রম।

"বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্"॥

'বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা এই সকল কর্ম্ম মোক্ষসাধন'।

"তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে"॥

তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের প্রথম মোক্ষসাধন।' তপস্যা দ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃতলাভ করা যায়'।

"সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ"॥

'এই সকল মোক্ষ সাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, উহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান এবং উহা হইতেই মোক্ষলাভ হয়।'

আত্মজ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ।

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি"॥

'আত্মযাজী সকল ভূতে আপনার আত্মাকে সমভাবে দেখেন এবং নিজ আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতের অবস্থান জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন'।

আত্মজ্ঞানীর সাধন।

"খং সন্নিবেশয়েৎ খেষু চেষ্টনস্পর্শনেঽনিলম্।
পক্তি দৃষ্ট্যোঃ পরং তেজঃ স্নেহেঽপো গাঞ্চ মূর্ত্তিষু॥"
"মনসীন্দুং দিশঃ শ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরম্।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিম্"॥

'অগ্রে দেহাকাশে বাহ্যাকাশ, চেষ্টা-স্পর্শের কারণ দৈহিক বায়ুতে বাহ্য বায়ু, অন্নপাককারী ও চক্ষুর তেজে বাহ্যতেজ, দেহস্থ জলে বাহ্যজল, শারীরিক পার্থিবাংশে বাহ্য পার্থিব মূর্ত্তি সকল; মনে চন্দ্র, শ্রোত্রে দিক্, পাদেন্দ্রিয়ে বিষ্ণু, বলে হর, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নি, পায়ুিন্দ্রিয়ে মিত্র এবং উপস্থে প্রজাপতি সন্নিবেশিত ভাবনা দ্বারা উহাদের একত্ব সাধন করিবে'।

"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামনীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যাং বিদ্যাৎ তং পুরুষং পরম্"॥

'পরে সকলের যিনি নিয়ন্তা, অণু হইতেও যিনি অণু, প্রকাশ স্বরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয় উপরম হইলেও যেমন স্বপ্নে মনের দ্বারা বস্তু দৃষ্ট হয় তদ্রূপ যিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও প্রসন্ন মনোবুদ্ধির গোচর সেই পরম পুরুষকে ধ্যান করিবে'।

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্" ॥

"সেই পরম পুরুষকে কেহ অগ্নি, কেহবা প্রজাপতি মনু, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ এবং কেহবা সচ্চিদানন্দময় রূপে উপাসনা করেন।"

"এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥"

'এইরূপে যিনি আত্মদ্বারা সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি সর্ব্ব সমতা প্রাপ্ত হইয়া পরমপদ রূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন'।

ইন্দ্রিয় সংযম।

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্" ॥

'সারথি যেমন অশ্বগণকে সংযত রাখে, বিদ্বান্ জন তদ্রূপ আকর্ষণশীল বিষয় সমূহে স্বতঃই ধাবমান ইন্দ্রিয়গণকে সুসংযম করিতে চেষ্টা করিবেন'।

"ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্জেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ" ॥

'ইচ্ছা করিয়া কোন ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত হইবে না। কোন বিষয়ে অত্যন্ত প্রসক্ত হইলে মনোবল দ্বারা ইন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করিবে'।

জিতেন্দ্রিয় কে?

"শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা ন বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ"॥

'স্তুতি বাক্যই বলুক বা নিন্দা বাক্যই বলুক, সুখ স্পর্শই কিছু হ'ক বা দুঃখ স্পর্শই কিছু হ'ক; সুদর্শন বা কুদর্শনই হ'ক, স্বাদু বা দুঃস্বাদু ভোজনই হ'ক, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ যুক্তই হ'ক কিছুতেই যাঁহার চিত্তে হর্ষ বা বিষাদ উৎপন্ন করিতে পারে না তিনিই জিতেন্দ্রিয়'।

"ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ শাত্রাদিবোদকম্"॥

'চর্ম্ম পাত্র একটি ছিদ্র দোষেও যেমন জলমগ্ন হয়, তদ্রূপ একটি ইন্দ্রিয়ও স্খলিত হইলে পরম জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয়'।

"বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাংসি চ।
ন বিপ্র দুষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কর্হিচিৎ"॥

'বেদ বল, দান বল, যজ্ঞ, নিয়ম, তপস্যাদি যে কোন পুণ্যকর্ম্ম বল, এ সকল বিষয়াসক্ত দুষ্ট বুদ্ধি ব্যক্তিকে কখনই সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ নয়'।

ভোগনিবৃত্তিতে সংযম।

"ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ"॥

'ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়োপভোগ হইতে নিবৃত্তি করিলেই যে তাহারা

সংযত হয় তাহা নহে; জ্ঞানালোচনা দ্বারাই তাহারা উপশান্ত হয়'।

ভোগে বাসনার বৃদ্ধি।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

'কাম্য বস্তু উপভোগেই বাসনার শান্তি হয় না, বরং ঘৃত সংযোগে অগ্নি যেমন অধিক প্রজ্বলিত হয় তদ্রূপ বিষয়ভোগে ভোগবাসনার আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।"

পরদারাভিগমনের বিষময় ফল।

"নহীদৃশ মনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্থেহ পরদারোপসেবনম্" ॥

'পরস্ত্রী গমনে যেমন আয়ুঃক্ষয় হয়, ইহসংসারে অন্য কোন ব্যাপারে পুরুষের তেমন আয়ুঃক্ষয় হয় না'।

বাক্য ব্যবহারে সংযম।

"ভদ্রং ভদ্রমিতি ব্রুয়াদ্ভদ্রমিত্যেব বা বদেৎ।
শুষ্কবৈরং বিবাদঞ্চ ন কুর্য্যাৎ কেনচিৎ সহ" ॥

অভদ্র বাক্য প্রয়োগ করিলেও উত্তরে ভদ্র বাক্যই বলিবে। কাহারও সহিত নিষ্প্রয়োজন শত্রুতা বা বিবাদ করিবে না'।

বাহ্যেন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সংযম।

"ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোঽনৃজুঃ।
ন স্যাদ্বাক্ চপলশ্চৈব ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ ॥"

'হস্ত, পদ এবং নেত্রের চাঞ্চল্য এবং বাক্‌চপলতা পরিহার করিবে। সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবে এবং পরের অনিষ্ট সাধনে বুদ্ধিকে নিয়োগ করিবে না।

সত্যবাক্য বলিবার নিয়ম।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃত্যং ব্রূয়াদেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥"

'সত্য কথা বলিবে; প্রিয় বাক্য বলিবে; অপ্রিয় সত্য বলিবে না, তাই বলিয়া মিথ্যা বাক্য প্রীতিকর হইলেও তাহা বলিবে না; ইহাই বেদসম্মত সনাতন ধর্ম্ম'।

কর্ম্ম।

"যদ্ যৎ পরবশং কর্ম্ম তৎ তদ্ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশঞ্চ স্যাৎ তৎ তৎ সেবেত যত্নতঃ॥"

'যাহা কিছু পরবশ কর্ম্ম, তাহা যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা কিছু আত্মবশ তাহা যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবে।'

"যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্য স্যাৎ পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥"

'যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মার পরিতোষ জন্মে, সযত্নে সেই কর্ম্ম করাই উচিত এবং যে কর্ম্ম করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।"

সদাচার ও কদাচারের কথা।

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধর্ম্মমক্ষয্য মাচারোঽন্ত্যলক্ষণম্॥"

'সদাচারবান্ হইলে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায়, মনোমত সন্ততি ও অক্ষয় ধন লাভ হয় এবং সহজাত কোন অলক্ষণ থাকিলে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়।'

"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥"

'কুল রেখাদি সর্ব্ব প্রকার শুভ লক্ষণ হীন হইলেও যেজন সদাচারবান, শ্রদ্ধাবান ও পরের মর্য্যাদা রক্ষক, তিনি শতবর্ষ জীবিত থাকেন।'

"দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেবচ॥"

'দুরাচার পুরুষ জনসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ুঃ হয়'।

অধর্ম্মে দুঃখ।

"ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোঽধর্ম্মে নিবেশয়েৎ।
অধার্ম্মিকাণাং পাপানামাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্"॥

'পাপী অধার্ম্মিকদিগের আশু বিপর্য্যয় ঘটে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া ধর্ম্মপথে থাকিয়া অভাবের দ্বারা অবসন্ন হইলেও কখন অধর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না'।

"অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি"॥

'অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, নানারূপ অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, শত্রুদিগকেও জয় করে, কিন্তু শেষে অধর্ম্মকর্ত্তা একেবারেই উন্মূলিত হয়'।

অসুখী কে?

"অধার্ম্মিকো নরো যো হি যস্য চাপ্যনৃতং ধনম্।
হিংসারতশ্চ যো নিত্যং নেহাসৌ সুখমেধতে"॥

'যে জন অধার্ম্মিক, অসত্যপথে যাহার ধনোপায়, এবং যে সতত পরহিংসায় তৃপ্ত থাকে, সে জন এই সংসারে কোন সুখলাভে অধিকারী হয় না'।

সর্ব্বথা কি বর্জ্জনীয়?

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।
দ্বেষং দম্ভঞ্চ মানঞ্চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ"॥

'নাস্তিকতা, বেদনিন্দা, দেবতাদিগের কুৎসা, দ্বেষ, দম্ভ,

অভিমান, ক্রোধ এবং পারুষ্য এই সকল একেবারেই বর্জ্জন করিবে'।

কাহার হিংসা করিতে নাই।

"আচার্য্যঞ্চ প্রবক্তারং পিতরং মাতরং গুরুম্।
ন হিংস্যাদ্ ব্রাহ্মণান গাশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈব তপস্বিনঃ" ॥

'বেদাধ্যাপক গুরু, বেদের ব্যাখ্যাতা, পিতা, মাতা, গুরু, ব্রাহ্মণ, গাভী ও সর্ব্বপ্রকার তপস্বী ইঁহাদিগকে কোনমতে হিংসা করিবে না'।

কঃ পন্থা?

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ন রিষ্যতে" ॥

'যে পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব পিতৃপুরুষেরা গমন করিয়াছেন, পূর্ব্ব পিতামহগণ যে পথাবলম্বী, সেই সাধুপথ—সেই পথেই যাওয়া কর্ত্তব্য। সে পথে গমন করিলে কাহারও নিন্দাভাজন হইতে হয় না'।

বেদ ও বেদজ্ঞের মহিমা।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্" ॥

'দ্বিজশ্রেষ্ঠ বরং শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান, ইন্দ্রিয়-জয় এবং বেদাভ্যাসের জন্য যত্ন করিবেন'।

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্র মিতি স্থিতিঃ" ॥

'বেদই পিতৃলোক দেবতা ও মনুষ্যের সনাতন চক্ষু, ইহা অপৌরুষেয় ও অপ্রমেয়—ইহাই স্থির মীমাংসা'।

"যথা জাতবলো বহ্নির্দহত্যার্দ্রানপি দ্রুমান্।
তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ" ॥

'যেমন জাতবল অগ্নি সজল কাষ্ঠকেও দগ্ধ করে, তদ্রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আপনার কর্ম্মজনিত দোষ সকল নষ্ট করেন'।

"বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ॥

'বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে বাস করুন না কেন, তিনি ইহলোকে থাকিয়াই ব্রহ্মত্ব লাভ করেন'।

উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব।

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ" ॥

'অজ্ঞ লোক অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ; গ্রন্থের অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি গ্রন্থোক্ত বিষয় ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তিনি শ্রেষ্ঠ; ধারণকারী অপেক্ষা যাঁহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী অপেক্ষা যিনি সেই জ্ঞানানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ।'

পঞ্চ মহাযজ্ঞ

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥"

'ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ জীবজন্তুকে খাদ্য দান; নৃযজ্ঞ অর্থাৎ অতিথিসৎকার (মনুষ্যের সেবা) এবং পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ শ্রাদ্ধাদি—এই পঞ্চ যজ্ঞের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিবে; শক্তি থাকিলে এ সমুদায়ের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেনা।'

অর্থার্জ্জন।

"সর্ব্বান্ পরিত্যজেদর্থান্ স্বাধ্যায়স্য বিরোধিনঃ।
যথা তথাধ্যাপয়ংস্তু সাহ্যস্য কৃতকৃত্যতা॥"

'যে কোন অর্থার্জ্জন স্বকীয় বেদাভ্যাসের বিরোধী হইবে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। যে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া প্রতিদিন স্বাধ্যায়দ্বারাই ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হ'ন'।

"নেহেতার্থান্ প্রসঙ্গেন ন বিরুদ্ধেন কর্ম্মণা।
ন বিদ্যামানেষ্বর্থেষু নার্ত্ত্যামপি যতস্ততঃ॥"

'যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শীঘ্র আসক্তি হয়, এমন সব গীত বাদ্যাদি কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয়; অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ অযাজ্য যাজনাদি দ্বারা, অথবা সম্পত্তি বিদ্যমান থাকিতে কিম্বা জীবিকার অত্যন্ত কষ্ট হইলেও যথা তথা হইতে ধন সংগ্রহের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে।'

নমস্য।

"দৈবতান্যভিগচ্ছেত্তু ধার্ম্মিকাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
ঈশ্বরঞ্চৈব রক্ষার্থং গুরূনেব চ পর্ব্বসু॥"

'অমাবস্যাদি পর্ব্বদিনে দেবপ্রতিমা, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ, রক্ষাকারী রাজা এবং পিতা মাতা গুরুজনগণকে দর্শন ও নমস্কারাদি করিবার জন্য যাত্রা করিবে'।

প্রতিগ্রহে দোষ।

"প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি"॥
"ন দ্রব্যাণামবিজ্ঞায় বিধিং ধর্ম্ম্যং প্রতিগ্রহে।
প্রাজ্ঞঃ প্রতিগ্রহং কুর্য্যাদবসীদন্নপি ক্ষুধা"॥

'প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিগ্রহ বিষয়ে প্রসক্তিত্যাগ

করিবে,কারণ প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। দ্রব্যাদি প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল বিশেষরূপে না জানিয়া প্রাজ্ঞজন ক্ষুধায় অবসন্ন হইলেও কখন প্রতিগ্রহ করিবেন না'।

তপস্যার বল

"ঔষধান্যগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনম্" ॥
"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্" ॥

'ঔষধ বল, নীরোগিতা বল, বিদ্যা বল,এবং নানাবিধ স্বর্গাদিতে স্থিতি সমুদায়ই তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হয়।—তপস্যাই তাহাদের সাধন। যাহা কিছু দুস্তর, যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্গম এবং যাহা কিছু দুষ্কর—সমুদায়ই তপস্যাসাধ্য; তপস্যাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।'

প্রায়শ্চিত্ত

"অজ্ঞানাদ্ যদিবা জ্ঞানাৎ কৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ ॥"
"যস্মিন্ কর্ম্মণ্যস্য কৃতে মনসঃ স্যাদলাঘবম্।
তস্মিং স্তাবত্তপঃ কুর্য্যাদ্ যাবৎ তুষ্টিকরং ভবেৎ ॥"

'অজ্ঞানকৃত হউক বা জ্ঞানকৃত হউক পাপকর্ম্ম করিয়া পাপমুক্ত হইতে ইচ্ছা থাকিলে, উহা আর দ্বিতীয় বার করিবে না। যদি কোন প্রায়শ্চিত্তে পাপকারীর চিত্ত লঘু না হয়, তবে সেই তপস্যা তাহাকে তাবৎ করিতে হইবে, যতদিন না তাঁহার চিত্ত-তুষ্টি জন্মে।'

"হীনাঙ্গানতিরিক্তাঙ্গান্ বিদ্যাহীনান্ বয়োধিকান্
রূপ দ্রব্য বিহীনাংশ্চ জাতিহীনাংশ্চ নাক্ষিপেৎ ॥"

'অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, বিদ্যাহীন, বয়োধিক, রূপহীন, ধনহীন, অথবা হীন জাতি ব্যক্তিদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব হীনতার উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিবে না।'

"নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ ॥"

'জিজ্ঞাসিত না হইলে শিষ্যব্যতীত আর কাহাকে কোন কথা বলিবে না। ভক্তি শ্রদ্ধাদি প্রশ্নধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথার উত্তর দিবে না। মেধাবী ব্যক্তি ঐরূপ, স্থলে জানিয়া শুনিয়াও লোক সমাজে মূকের ন্যায় ব্যবহার করিবেন।'

ধর্ম্মই বন্ধু ও পরকালের সহায়।

"মৃতং শরীর মুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি" ॥

"তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্ ॥"

'কাষ্ঠ লোষ্ট্রের ন্যায় মৃত শরীরকে ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বান্ধবগণ যখন বিমুখ হইয়া গৃহে গমন করেন তখন কেবল ধর্ম্মই সেই জীবের অনুগমন করিয়া থাকে ; অতএব পরলোকের সাহায্যার্থ প্রতিদিন অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে ; ধর্ম্মের সাহায্যে দুস্তর নরকাদি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।'

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকার প্রণীত।

দিনচর্য্যা ঃ—প্রত্যেক হিন্দু জীবনকে সুন্দর, মহৎ ও সার্থক করিবার জন্য বহু উপদেশ পূর্ণ জ্ঞানগর্ভ সুললিত ভাষায় রচিত সুন্দর গ্রন্থ। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই। কাগজ ভাল ও মুদ্রাঙ্কন সুন্দর অথচ মূল্য যথা সম্ভব সুলভ। চারি আনা মাত্র।

দেশমান্য সুকবি—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত :— আপনার দিনচর্য্যা প'ড়ে উৎসাহ এবং উপকার পেয়েছি। এ বইটি কাজের হয়েছে এবং এরমধ্যে ভাবেরও অভাব নাই।

ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অভিমত :—দিনচর্য্যা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি * * * আদ্যোপান্ত পড়িয়া অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। লেখা সরল, গুরুতর গুহ্য বিষয় সকল সরলভাবে বিবৃত; এরূপ গ্রন্থ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই পুস্তকাগারে থাকা উচিৎ। আপনার দিনচর্য্যা গ্রন্থের নিমিত্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ হইলাম।

পাকুড়রাজ স্কুলের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত লালমোহন গোস্বামী মহাশয়ের অভিমত :—বালকগণের সর্ব্বাঙ্গীন সৎশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন জন্য এবং তদ্দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন জন্য গৃহে গৃহে এই পুস্তক খানি রক্ষিত হওয়া সর্ব্বোতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

টি এন জুবিলি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের অভিমত :—পুস্তক খানি উপদেশপূর্ণ ও ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মের বহু সার কথা সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকখানি পড়িয়া আমি অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

রাজা বনবিহারী কর্পূর সি, এস, আই মহোদয়ের অভিমত :—আপনার পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিলাম। ইহাতে অতি কঠোর দুরূহ ও আধ্যাত্মিক বিষয় সকল এমন সরল ভাষায় প্রাঞ্জল ভাবে বিবৃত হইয়াছে যে ইহা সাধারণ পাঠকগণের সহজে বোধগম্য হইবে। ইহা অতীব প্রশংসনীয়।

প্রবাসী, উদ্বোধন প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় একবাক্যে প্রশংসিত।

"অভ্যাসযোগ" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে গীতোক্ত অভ্যাসযোগ ও যোগবাশিষ্ঠের অপূর্ব্ব মত সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গুরুদাস বাবুর দোকান, ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস, মজুমদার লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান পুস্তকালয়ে, ৭৮।২ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ডাক্তার কানাইলাল গুপ্ত বি, এর নিকট ও কাশী যোগাশ্রমে প্রাপ্তব্য।

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী।

অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—ইহাতে ভারত-ভ্রমণের সহিত সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মজীবনের বিবিধতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধযোগী ধীরবীর্য্যকৃত হিমালয়স্থিত ঋদ্ধিমন্দিরের বিস্ময়কর বিবরণ পাঠে অনেকে চমৎকৃত ও পুলকিত হইবেন। ইহাতে যোগতত্ত্ব ও সাধনক্রম সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ।৶০ মাত্র।

বিচার-প্রকাশ—এই পুস্তকে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরুদেব সিদ্ধ পরমহংস বাবা দয়ালদাসজীর জীবনী ও উপদেশবাণী সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা পাঠে আদর্শ সাধুজীবন ও বেদান্ত-শাস্ত্রীয় সার মর্ম্ম এবং সন্ন্যাস ও সাধন বিষয়ক সমস্ত কথাই জানিতে পারিবেন। একাধারে বিবিধ দার্শনিক মীমাংসা, গীতার সূত্রস্বরূপ দ্বিতীয়াধ্যায়ের গূঢ়ার্থ, এবং মুক্তিলাভের উপায় ও অনুষ্ঠান পরিস্ফুটরূপে বিবৃত হইয়াছে। ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য ॥০ মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ॥৶০।

পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

প্রবোধ কৌমুদী—পাঠে মোহ নিদ্রা হইতে মন প্রবুদ্ধ হয়—৶০

নীতিরত্নমালা— ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-সম্বন্ধীয় অমূল্য উপদেশে পূর্ণ—৶০

(এই দুইখানি পুস্তকই ছাত্র-দিগের চরিত্র গঠনে বিশেষ উপযোগী)

বক্তৃতা ও পুষ্পাঞ্জলি—পরিব্রাজকের অমৃতময়ী ধর্ম্মব্যাখ্যায়, স্বদেশভক্তি ও স্বধর্ম্ম শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধমালায় পূর্ণ। পাঠে দুর্ব্বলের মনও সবল হয়, পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়।

এফ, এ ও বি, এ পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা ভাষায় দক্ষতা লাভের বিশেষ উপযোগী-সুমার্জ্জিত ভাব ও ভাষায় আদর্শ স্বরূপ উপরোক্ত পুস্তকদ্বয় একত্রে—১।৵০।

জ্ঞান-দীপিকা—এই বৃহৎ গ্রন্থখানি জ্ঞান ও ভক্তি সাধনানুকূল প্রবন্ধাবলীতে পূর্ণ। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী লিখিয়াছেন—"প্রবন্ধ গুলিতে সাধনলব্ধ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বিকাশের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ লহরীমালা ক্রীড়া করিতেছে। ডিমাই ৮পেজী ৩৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ এক্ষণে কিছুদিনের জন্য সিকি মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। কেবল ডাকব্যয়ই ৵০ দুই আনা পড়িবে। ডাকব্যয়সহ মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

গৌড়পাদীয় আগম—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের পরম-গুরু ও শুকদেব-শিষ্য শ্রীশ্রীগৌড়পাদাচার্য্যকৃত। ইহাই অদ্বৈত-মতের মূল গ্রন্থ। ইহাকেই আদর্শ করিয়া শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্য রচনা পূর্ব্বক জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন। বেদান্ত শাস্ত্রের সম্যক্ জ্ঞান জন্য এতৎ গ্রন্থরত্নের আলোচনা একান্ত আবশ্যক। ইহা ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েরই সমান আদরের সামগ্রী। সংস্কৃত মূল ও বিস্তৃত বাঙ্গালা ব্যখ্যাসহ মূল্য চারি আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ম্যানেজার, কাশী, যোগাশ্রম বেনারসসিটি।